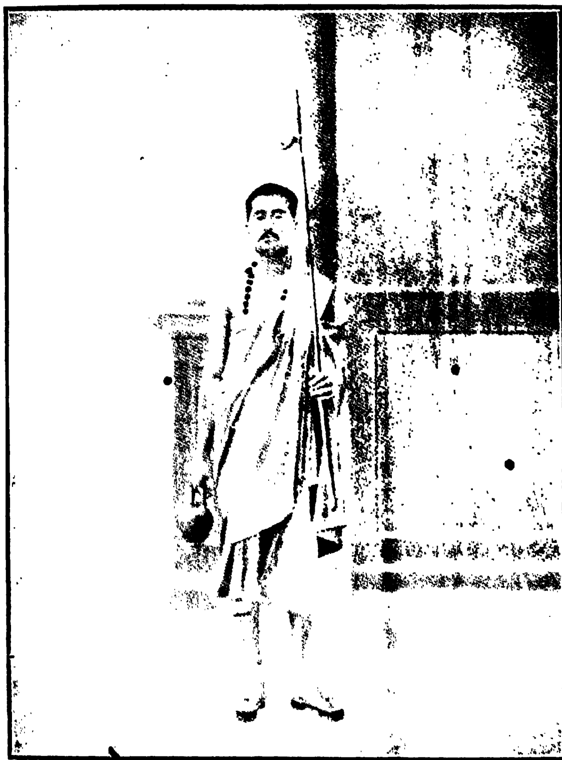
রাজনীতি

বাঁধন ছিড়িতে হবে এই মোর মতি,
লক্ষকোটী প্রাণীসহ মোর একগতি।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে?



স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

বাঁধন ছিঁড়িতে হবে এই মোর প্রীতি,
লক্ষকোটী প্রাণীসহ মোর একগতি।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে?



স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

রাজনীতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

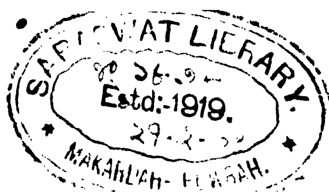
১৩৩৩

মূল্য ২৲

প্রকাশক—
শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ
শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল।

—o:*:o—

শ্রীসরস্বতী প্রেস
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের দুর্ভাগ্য যে 'রাজনীতির' দ্বিতীয় সংস্করণের সময় গ্রন্থকার জীবিত নাই। তিনি জীবিত থাকিলে হয় ত আরও কোন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব আরও বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে!

ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক আদর্শের সহিত ভারতীয় আদের্শর তুলনা করিবার জন্যই স্বামীজির এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াস। আজ কাল যাহারা ভারতের প্রাচীন সাধনা ও জ্ঞানে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আস্থাহীন, আর যাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, ভারতীয় সাধনা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহারা উদাসীন। সুতরাং জাতীয় জাগরণের এই উষাকালে উভয় দেশীয় রাজনৈতিক আদর্শের তুলনা-মূলক সমালোচনা যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা

সমধিক পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

অনেকদিন পূর্ব্বেই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছিল ; কিন্তু নানা প্রকার প্রতিকূলতার জন্য আমরা এ যাবৎ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই। সম্প্রতি নারায়ণের কৃপায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আশা করি সুধী-মণ্ডলীর সহানুভূতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনেক উৎকৃষ্ট করা হইয়াছে, তজ্জন্য পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীশঙ্করমঠ,
বরিশাল।
১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩।

শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় মতের আভাস ১—৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় মতবাদ ৪৩—১৮৩

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় মতের বিশেষত্ব ১৮৪-৩১৮

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়



ভূমিকা

গ্রন্থ লিখিলেই ভূমিকা লিখিতে হয়—ইহাই সনাতন প্রথা। সনাতন বিধি অনুসরণ করিয়া এই প্রবন্ধেরও ভূমিকা লিখিতে হইলে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ ইউরোপীয় রাজনৈতিক আদর্শের সহিত ভারতীয় আদর্শের তুলনা করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় মতবাদ আমাদের দেশীয় ভাষায় অনূদিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ, ইউরোপীয় ভাষার গতি ও পরিণতি ভারতীয় ভাষা হইতে পৃথক্। সাধারণ ভাবে ভাষার প্রয়োগে কতকটা ভাবসাম্য রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগ একপ্রকার অসম্ভব। ভারতীয় দার্শনিক শব্দের গতি প্রতীচীন এবং ইউরোপীয় দার্শনিক শব্দের গতি অনেক পরিমাণে পরাচীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোধ হয় দুই একটী শব্দের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'শ্রদ্ধা' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরাজী ভাষায় পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা স্বতঃ—স্বাভাবিক। কিন্তু 'respect বা revere

প্রভৃতি শব্দে আদান প্রদানের ভাব পরিস্ফুট। Re অর্থ back এবং specio—to look হইতে respect শব্দটী নিষ্পন্ন। অপরে আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি দিবে, তাহার প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়াই respect শব্দের মৌলিক অর্থ। এইরূপ re এবং veror—to feel awe of, to fear হইতে revere শব্দটী নিষ্পন্ন। সুতরাং আমাদের দেশীয় শ্রদ্ধা শব্দের প্রতিশব্দ respect বা revere হইতে পারে না। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ইহা চলিতে পারে, কিন্তু দার্শনিক ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগে ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্য। আমাদের 'আত্মা' শব্দের প্রতিশব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নাই। soul বা self শব্দ ইহার প্রতিশব্দ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহুশব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সেইরূপ ইউরোপীয় idea, theoretical, apperception প্রভৃতি শব্দের প্রতিরূপ শব্দ আমাদের ভাষায় খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। Theoretical শব্দের প্রতিশব্দ 'ঔপপত্তিক' স্থলবিশেষে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে সুসঙ্গত হয় না। ভাষার এইরূপ ভিন্নতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মতবাদ প্রপঞ্চিত করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। আমরা ভাবের অনুবাদ করিয়াছি, কিন্তু ভাষা অনূদিত হয় নাই। এ বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে,

সুধীব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে উপদেশ দিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে দোষ সংশোধন করিতে সচেষ্ট থাকিব। ইউরোপীয় মতবাদ প্রসঙ্গে ভাষা তত সরল ও সহজ-বোধ্য করিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমাদের এ দোষ ক্ষমার্হ। কারণ, ভাব রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের ঐ দোষটী হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ভাবের দিকে প্রবণতার বশে ভাষা সরস করিয়া গড়িতে পারি নাই। ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ভাষার দীনতা স্বাভাবিকও বটে। অনেক সময়ে ভাষার প্রাবল্যে ভাব ঢাকা পড়ে; সেই ভয়েও ভাষার দিকে অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই। অন্য কারণও বিদ্যমান; প্রাণের ভাবে যে ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই লিখিয়াছি। স্থল বিশেষে ভাষার যে দোষ আছে তাহাও পরবর্ত্তী সংস্করণে বিদূরিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বহু সংস্কৃত উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। অনেকে মৌলিক গ্রন্থের প্রামাণিক বাক্য না দেখিলে, ভারতে যে কোনও দিন কোনও রূপ ব্যাবহারিক জগতের চিন্তা ছিল, তাহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এই জন্যই আমরা বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। চাণক্য প্রণীত অর্থ-

শাস্ত্রে শাসনযন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থা আছে। যে দার্শনিক ভিত্তিতে অনুশাসনগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, এই প্রবন্ধ তাহার কতকটা সাহায্য করিতে পারে।

আমরা ভূমিকা লিখিতে বসিয়া কেবল 'কৈফিয়ৎ' দিলাম; সুতরাং ইহাকে ভূমিকা না বলিয়া নিবেদন বলিলেও ক্ষতি নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ প্রীত হউন। যিনি দেশের, জাতির অন্তরাত্মা, যিনি রাষ্ট্রীয় শক্তির মূলাধার, তিনি প্রীত হউন। রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া তাঁহার যে শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই শক্তির উদ্বোধন হউক। আমরা আমাদের প্রযত্ন তাঁহারই চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা
রাসপূর্ণিমা
১৩২৭

গ্রন্থকার



রাজনীতি।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতীয় মতের আভাষ।

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করা মানবের স্বভাব। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব সমাজবদ্ধ হইয়াছে, আপনার পূর্ণ বিকাশের জন্যই সমাজকে বরণ করিয়াছে। সম্যক্ উন্নতি বিধানের জন্যই সমাজ। যাহা সম্যগ্‌রূপে উন্নতির সহায়, তাহা সমাজ। সম্ পূর্ব্বক গমনার্থক অজ্ ধাতু হইতে সমাজ শব্দটি নিষ্পন্ন। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয় বলিয়াই রক্ষকের প্রয়োজন। সঙ্ঘাত হইলেই রক্ষণশক্তির আবশ্যকতা; সঙ্ঘের শৃঙ্খলা রক্ষা না করিলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ ও রক্ষকের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মস্তিষ্ক স্নায়ুমণ্ডলের রাজা বা চালক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। এই পরিচালক বা রক্ষক-শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে সঙ্ঘাত রক্ষা করিতেছে। সমাজ সংহননের ফল। কোন শক্তিকে মূল করিয়াই সঙ্ঘাতের উদ্ভব। জীবদেহ

সঙ্ঘাতের ফল। ক্ষুদ্র কোষ হইতে (mono-cellular) সংহননের ফলে জীবদেহ। মৌলিক শক্তিই শরীরকে ধারণ ও পোষণ করে। আধ্যাত্মিক প্রাণবায়ু শরীরের রক্ষণশক্তি। সমাজ-সঙ্ঘাত রক্ষা করিতে হইলেই প্রকৃতি-সিদ্ধ রক্ষক আবশ্যক। এই রক্ষকই রাজা। রাজা যে নীতিবলে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, তাহাই রাজ-নীতি বা রাজ-ধর্ম্ম।

পশুপক্ষীও স্বাভাবিক ভাবে দলবদ্ধ হয়। তাহা-দেরও দলপতি বা রাজা থাকে। হস্তীর যূথপতি আছে। ব্যাঘ্র দলবদ্ধ হইলে উহাদের দলপতি থাকে; বানর সঙ্ঘবদ্ধ হয়, উহাদের নেতা আছে; অনেক মৎস্য দল বাঁধিয়া বেড়ায়, ইহাদেরও পিতা বা মাতা রক্ষক; পক্ষীও দলবদ্ধ হয়, ইহাদেরও নায়ক থাকে; পিপীলিকা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে, ইহাদেরও রক্ষকরূপী রাজা আছে। মধুমক্ষিকারও রাজা বিদ্যমান। সমাজ থাকিলেই রক্ষক থাকিবে। ইহা প্রাকৃতিক বিধান। ইহা সনাতন শাশ্বত ভগবদ্‌বিধি। মাতৃভাব (matri-archal) অথবা পিতৃভাবই (patriarchal) হউক, রক্ষক থাকিবেই। রাজভাব মাতৃভাব কিম্বা পিতৃভাবের অভিব্যক্তি, সে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই;

মোটামুটি রক্ষণশক্তির আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। সমষ্টির শক্তি রাজশক্তি। পশুজগতে শারীরিক বলশালীই রক্ষক। সিংহ পশুরাজ। সিংহের মহত্ত্ব আছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজশক্তির উদ্ভব। ইহা গড়ান-পিটান জিনিষ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বভাবজ। দেহ সংহননের ফল। সংহননের মূলে শক্তির আবশ্যকতা। প্রাণি-বিদ্যায় (biology) জান্তব প্রকৃতির (organism) সংহননের মূলে ব্যাপকশক্তি। সেই ব্যাপকশক্তি সকল জান্তব প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত। অন্যথা জান্তব প্রকৃতি মরিয়া যায়। এই পরিব্যাপ্ত সমষ্টি শক্তিই প্রাণিশরীর ধারণ করে। শরীর-বিজ্ঞানের (physiology) কোষগুলি (cells) এক শক্তিতে সংহত। সেই শক্তি মৌলিক ও পরিব্যাপ্ত। ইহাতেই কোষগুলি বিধৃত। ইতর প্রাণীতে বলশালী দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় প্রদান করে। দার্শনিক স্পেন্‌সারের ভাষায় ইহা "survival of the fittest"; বৈজ্ঞানিক ডারউইনের "natural selection" বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও ঐ শক্তির বিকাশ। দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার আমেরিকার সামাজিক জীবনের গলদ দেখিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন ও শাসনযন্ত্র গঠনের দোষ দেখাইয়া-

ছিলেন। তাঁহার মতে আমেরিকার শাসনযন্ত্র 'গড়ান-পিটান' জিনিষ। উহা অদৃষ্টের ধাক্কায় (chance combination) গঠিত হইয়াছে। স্বাভাবিক গতিতে বিকাশ না পাওয়ায় মার্কিনের সামাজিক জীবন আশানুরূপ সমুজ্জ্বল হইতে পারে নাই। এই দোষ বিদূরিত করিবার উপায় সম্বন্ধে কোন আমেরিকাবাসী বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শিক্ষা-বিস্তারে ও রাজনৈতিক জ্ঞানে এই দোষ সংশোধিত হইতে পারে কি না। তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"No, it is a question essentially depending on character, and only in a subordinate sense on knowledge. It is a frequent delusion that education is a universal remedy for political evils." অর্থাৎ "না, ইহা চরিত্রের উপর একান্ত নির্ভর করে, আংশিকরূপে জ্ঞানের উপরেও। রাজনৈতিক অনাচারের শিক্ষাই একমাত্র ঔষধ—এই ধারণা অতীব ভ্রান্ত।" বাস্তবিক দার্শনিক স্পেন্সারের বাক্যের সার্থকতা আছে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র জাতীয় চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহাতে স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে না।

স্বাভাবিকতা না থাকিলে বিকাশ অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজশক্তি স্বাভাবিক। রাজশক্তি তৈয়ারী করা বস্তু নহে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সমকালে সাধন করিবার জন্য শৃঙ্খলা আবশ্যক। প্রত্যেক জান্তব প্রকৃতি ও সমষ্টি প্রকৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ প্রাণি-বিজ্ঞানের মৌলিক শক্তি, সেইরূপ ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের জন্য রক্ষণশক্তি—রাজশক্তি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ভগবচ্ছক্তির বিকাশ, এই ভগবচ্ছক্তিই রাজশক্তি। আপনাতে আপনি থাকা মানবের স্বরূপ। সমষ্টিতে আপনাকে ব্যাপ্ত দেখা মানবের ধর্ম্ম। ব্যাপকতা সংসাধনই ধর্ম্ম। ব্যক্তিত্বের প্রসারে সমষ্টিতে অবগাহন করিলেই চিত্ত নির্ম্মল হয়। জ্ঞানী সর্ব্বাত্ম-প্রেমিক। জ্ঞানই মানবের চরম লক্ষ্য।

রাজশক্তি জাতিকে ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাই রাজা নমস্য। জীবের ব্যাবহারিক জগতে ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্বের বিকাশ আবশ্যক। ব্যষ্টির ও সমষ্টির বিকাশের সামঞ্জস্য আছে। যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তাহা সমষ্টির পক্ষেও সত্য। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমষ্টির বিকাশের প্রতিকূল হইলে, সে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে

রাজনীতি।

সমষ্টির পেষণে ব্যক্তিবিশেষ প্রপীড়িত হইলেও সমষ্টির অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। মানবদেহের সকল অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধিতে যেমন স্ফূর্ত্তি হয়, কোন অঙ্গ দুর্ব্বল থাকিলে তাহা হইতে পারে না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও প্রেমে সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। কারণ, সন্ন্যাসী সর্ব্বাত্মপ্রেমিক। গৃহের নিকটে অন্য বাড়ীর দূষিত মল নিজেরও অপকার করে। বায়ুমণ্ডলের জীবাণু সকল শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশই লক্ষ্য। তাহাই আদর্শ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া ব্যক্তির জীবন গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। ব্যক্তির বিকাশেও সমষ্টির বিকাশ সাধিত হয়। যোগী সমাজ হইতে দূরে থাকিয়াও নীরবপ্রভাবে সমাজকে জাগরিত রাখেন। ব্যক্তি লইয়াই সমষ্টি।

উন্নতি সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। উহা স্বাভাবিক। এমন কি, উন্নতি প্রার্থনা করে বলিয়াই লোকে পরশ্রীকাতর হয়। উন্নতির পরিপন্থী বিষয় দূর করিতে হইবে। আপনার উন্নত জীবন আরও সমুন্নত করিতে হইবে। স্বাভাবিক রূপেই আদান-প্রদান আবশ্যক। ব্যাধি হইয়াছে; শরীরের রস, রক্ত ক্ষয় হইতেছে;

বাহিরের প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিয়া ভিতর পূর্ণ করিলাম, বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিয়া আবার বাহিরে বিতরণ করিলাম,—ইহাই প্রাণ। মানুষ বৃক্ষ সকলের জন্য অঙ্গারাম্ল (carbonic acid gas) ত্যাগ করিয়া বৃক্ষকে বাঁচাইতেছে। আবার বৃক্ষও মানবীয় ধাতুগঠনের সহায়তা করিতেছে। এই আদান-প্রদান সরল ও স্বাভাবিক। জল আকর্ষিত হইয়া উচ্চ চৌবাচ্চায় রক্ষিত হয় এবং তথা হইতে উচ্চ ত্রিতল গৃহেও প্রেরিত হয়। জলের নিম্নদিকে গমন যেমন স্বভাব, সমতলতা রক্ষা করাও তেমনই স্বভাব। জীবের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা যেরূপ স্বভাব, আদান-প্রদানও সেইরূপই স্বভাব। এই সনাতন ভাবের ভিতর দিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে—রক্ষক বা রাজাকে বরণ করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে পুরুষসূক্তের শ্রুতিটি দেখিতে পাই,—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।" রাজা বিরাট্‌পুরুষের অঙ্গ। রাজা বিরাট্‌পুরুষের বাহুবল। বাহু হৃদয়ের উপলক্ষণ। রাজা বিরাটের হৃদয়ের বল। রাজা শক্তির উৎস। রাজশক্তি ভগবচ্ছক্তি। মনু বলিতেছেন, রাজা ভগবানের সৃষ্টি—

রাজনীতি।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোঽভিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥" ৭।৩

অর্থাৎ "এই লোক অরাজক হইলে প্রবল হইতে দুর্ব্বলের ভয় উৎপন্ন হইবে। তাই সকলের রক্ষার্থ ভগবান্ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" লোকরক্ষাই রাজধর্ম্ম। ভগবান্ নিজে সৃষ্টির পালক ও রক্ষক। তিনি তাঁহার নিজস্ব শক্তির অনুবলে লোকরক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু আরও বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাং চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥" ৭।৩৫

অর্থাৎ রাজা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিবিষ্ট সকল ব্যক্তির ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিরক্ষক।

ধর্ম্মরক্ষা রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে জগতের স্থিতি রক্ষিত হয়। ভগবানের জগৎরক্ষণশক্তি রাজাতে অভিব্যক্ত। রাজা ধর্ম্মের প্রতিপালক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"রাজা ধর্ম্মস্য কারণম্।" শাস্ত্রে, রাজা দেবতাসমূহের শক্তি গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য—রাজশক্তি দেবশক্তি। দেবগণ জগৎস্থিতির রক্ষক। আধ্যাত্মিক দেবগণ যেমন শরীরের রক্ষক, সেইরূপ জগতেরও

রক্ষক। সেই রক্ষণশক্তির অভিব্যক্তিই রাজা। মানব-সৃষ্টির সহিত রাজশক্তির উদ্ভব। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছে, রক্ষকরূপী রাজাও উদ্ভূত হইয়াছেন। মানসিক বলে বলীয়ান্, শারীরিক তেজে তেজীয়ান্, আধ্যাত্মিক বীর্য্যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি রাজারূপে প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা প্রাকৃতিক মনোনয়ন। দার্শনিক স্পেন্সারের ভাষায় "survival of the fittest"। সৃষ্টির আদিতে মানুষ সভাসমিতি করিয়া রাজপদের সৃষ্টি করে নাই বা একজনকে রাজা বলিয়া মনোনয়ন করে নাই। স্বাভাবিক ভাবেই বলশালী, বীর্য্যবান্ ব্যক্তি আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার অনুশাসন সমষ্টির হিতকল্পে বিহিত হওয়ায়, সকলের বিকাশের সহায়ক হওয়ায় সকলেই মাথা পাতিয়া মানিয়া চলিয়াছে, কোনরূপ চুক্তির আবশ্যকতা দেখা যায় নাই। গ্রীসদেশের পিতৃশাসন (patriarchal form of government) স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত। রাজশাসন যদি পিতৃশাসনের ক্রমপরিণতি হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, উহাতে চুক্তির চিহ্নমাত্র নাই; কারণ, শিশু পিতার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় না, স্বাভাবিক প্রেরণায় পিতা পুত্রের রক্ষক। পিতার শাসন মানিবার

জন্য সভাসমিতি করিতে হয় নাই। যদি মাতৃভাবই রাজ-শাসন বা সমাজ-শাসনের মূলীভূত হয়, তাহা হইলেও চুক্তির কোন অবসর নাই। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ রাজশক্তির অনুশাসন স্বীকার করিয়াছে। মাতৃশাসন—পিতৃশাসন—দলের শাসন—সামাজিক শাসন এবং ক্রমে রাষ্ট্রীয় শাসন, এই ধারা স্বীকার করিলেও বলিতে হয়, উহা স্বাভাবিক। শক্তিমান্ পুরুষের নিকট অবনত হওয়া স্বাভাবিক। হিসাব করিয়া ভালবাসা হয় না। বিচারে ভালবাসার সংস্কার ও অনুশীলন হইতে পারে। বিচার ও হিসাব পৃথক্ জিনিষ। শ্রদ্ধার উপরে রাজার রাজসিংহাসন। শক্তিমানের এমনই একটা প্রভাব যে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। ইহা ভগবদ্‌ভাব। ভগবচ্ছক্তির দিকে আমাদের টান সহজ। সেই আগ্রহে আমরা শক্তিমানের দিকে আকৃষ্ট হই। শক্তিমান্ আপন শক্তির প্রভাবে আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টির আদিম কালেও শক্তিমান্ আপন প্রভাবেই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে। শক্তিমানের যথেচ্ছাচার নিবারণের জন্য দুইটি উপায় আছে। একটি বিধিপালন, অন্যটি চুক্তি। ইউরোপে 'রাজশক্তির প্রবলতায় প্রজাগণ ক্ষিপ্ত

হইয়া রাজাকে চুক্তিবদ্ধ করিয়াছে ; কিন্তু ভারতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে রাজার ধর্ম্মবিধি পালন করিতে হইয়াছে ; রাজা প্রজার প্রতিভূ, রাজা ধর্ম্মের প্রতিভূ। ইউরোপে রাজাকে প্রজার প্রতিভূ করিবার জন্য কত রক্তারক্তি হইয়াছে। কিন্তু ভারতে স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মানুশাসনের বলে রাজা প্রজার প্রতিভূ। মনু বলিয়াছেন,—

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥" ৭।১৭

"রাজদণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা এবং শাসক : সেই রাজদণ্ডই চতুর্ব্বর্ণের, আশ্রমের এবং ধর্ম্মের প্রতিভূ।" অতএব রাজা, প্রজা ও ধর্ম্মের প্রতিনিধি মাত্র। আরও, রাজার শরীর রাজা নহে, রাজার দণ্ড বা শাসনই রাজা। তাই রাজার যথেচ্ছাচারী হইবার অধিকার নাই। তাঁহাকে ধর্ম্মবিধি পালন করিতে হইবে। তাঁহার প্রণীত দণ্ডেই তিনি দণ্ডিত হইবেন। ধর্ম্মবিধি পালন না করিলে তিনি দণ্ডার্হ। ভগবান্ মনু বলিতেছেন,—

"দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥" ৭।২৮

অর্থাৎ দণ্ডের তেজ মহান্, অসংযত ব্যক্তির পক্ষে দণ্ডধারণ

অসম্ভব। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজাও দণ্ডদ্বারা নিহত হন। দণ্ড ভগবানের সৃষ্ট বস্তু। লোক রক্ষার জন্যই দণ্ডের উদ্ভব। রাজার রাজকার্য্যের জন্যই দণ্ডের প্রয়োজন। সর্ব্বভূতের পালনই রাজধর্ম্ম। "প্রজানাং চৈব পালনম্" ইহাই রাজার পরম ধর্ম্ম। ইহাই তাঁহার শ্রেয়ঃ। রুদ্ররূপী ভগবানই দণ্ড। ভগবান্ লোক রক্ষার জন্যই ধ্বংস করেন। পালনের জন্যই তাঁহার শাসন। মনু বলিতেছেন,—

"তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥" ৭।১৪

রাজার কার্য্যের জন্য সর্ব্বভূতের রক্ষকরূপী দণ্ডকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন। দণ্ড ভগবানের আত্মজাত। উহা ব্রহ্মতেজোময়। রাজদণ্ড বা রাজশক্তি তাই ভগবচ্ছক্তির বিকাশ। ভগবানের শাসনে যেমন শৃঙ্খলা ও বিচার আছে, রাজশাসনেও সেইরূপ শৃঙ্খলা ও বিচার থাকা আবশ্যক। রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ভারতে চুক্তিবাদের আবশ্যক হয় নাই। ধর্ম্মের শাসনে রাজা প্রজার প্রতিনিধি মাত্র, ধর্ম্মের অনুশাসন তাঁহাকে মানিতে হইয়াছে। ভারতে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি সাম্রাজ্য স্থাপনের

প্রচেষ্টাসূচক যজ্ঞেরও যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ। যিনি বিশ্বনরের আশ্রয়, তিনিই যজ্ঞেশ্বর। তাঁহারই প্রীতির জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ইহাতে রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে, সাম্রাজ্য-মদমত্ততাও স্থান পায় নাই। ইউরোপে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন। ইহাতে রাজশক্তি অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজার শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত, ইহাতে বাধা প্রদানে কোন মানুষের অধিকার নাই,—এইরূপ মতবাদ ইউরোপে বিস্তৃত ছিল। ভারতে এরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। ভারতে রাজশরীর দেবশরীর হইলেও রাজাকর্তৃক পরিচালিত শাস্ত্রীয় দণ্ডই প্রকৃত রাজা। পশুরাজ্যে পাশববল অন্যান্য পশুগণকে মারিয়া ফেলে। মানবের রাজশক্তি পাশববলে প্রতিষ্ঠিত নহে। কারণ, মানব পশু হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। মানবের কল্যাণের বোধ আছে, পশুর তাহা নাই। জগতের কল্যাণের জন্যই রাজশক্তির প্রকাশ। তাই রাজা নিরঙ্কুশ (absolute) হইতে পারেন না। রাজশক্তি উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম হইলে ভারতীয় বিধানে রাজা বধ্য। মহাভারতে বামদেব বলিতেছেন,—"অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা" অর্থাৎ যে রাজার মন্ত্রী অসৎ ও পাপিষ্ঠ,

রাজনীতি।

যে রাজা ধর্ম্মনাশকারী, সেই রাজা বধ্য। * ইউরোপে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আবশ্যকতা হইয়াছে, রাজশক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য প্রজাগণ বিপ্লব করিয়াছে, সামান্য নিয়ম করিয়া রাজার শক্তি খর্ব্ব করিয়াছে; আবার রাজশক্তি উদ্দত ও মদমত্ত হইয়াছে; আবার অভ্যুত্থান, আবার নিয়ম। এইরূপে চুক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতে তাহা হয় নাই, স্বাভাবিক ভাবেই রাজা প্রজাগণের প্রতিভূ হইয়াছেন। রাজশক্তিকে দমন করিবার জন্য ধর্ম্মানুশাসন রহিয়াছে। মনু বলিতেছেন,—

"তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥"

অর্থাৎ রাজা সমুচিত দণ্ড প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গফল লাভ করেন। কিন্তু কামান্ধ, ক্রোধী, ছলান্বেষী হইলে

---

* অধর্ম্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপযাতোঽস্মাদুভৌ প্রথমমধ্যমৌ॥ ৮
অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি॥ ৯
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম পর্ব্ব—
বামদেবগীতা ৯২ অধ্যায়—শ্লোক ৮।৯

দণ্ড দ্বারাই নিহত হন। ইহার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"দণ্ডেনৈব নিহন্যতে প্রকৃতিকোপেনাদৃষ্টেন বা দোষেণ" অর্থাৎ দণ্ডদ্বারাই নিহত হন—প্রজার কোপে অথবা অদৃষ্ট দোষে। রাজা যে দণ্ডিত হইতেন, তাহার দৃষ্টান্তও মনু প্রদান করিয়াছেন। বেণ, পিজবনপুত্র স্থদা, সুমুখ ও নিমিরাজা নীতিভঙ্গদোষে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চুক্তিবাদ ভারতে স্থান পায় নাই। রাজা ও প্রজার চুক্তি কল্পনামূলক। ইহার ভিত্তি প্রকৃতিতে নাই। যে স্থানে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সে স্থানে চুক্তিবাদের কল্পনা টিকিতে পারে না। চুক্তিবাদ হইতে ধর্ম্ম বিধিপালন শ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইউরোপ চুক্তিটা সহজে বুঝে। কারণ, বণিগ্‌বৃত্তি ইউরোপের প্রাণ। ভারতে ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাজা প্রজার প্রতিনিধি; রাজশক্তি অনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে নাই, কোনওরূপ সঙ্ঘর্ষের ফলে সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয় নাই। চুক্তির বিষম দোষ বিপ্লববাদ। ধর্ম্মের অনুশাসন-বলে স্বাভাবিক নেতাই রাজা হইয়াছেন, নির্ব্বাচন প্রথার দোষগুলি আসিতে পারে নাই। নির্ব্বাচন-প্রথায় (১) স্বাভাবিক নেতার মনোনয়ন হয় না ; (২) উনিশের মত ও বিশের মত—কোন্‌টি গ্রাহ্য, তাহা

নির্ণয় অসম্ভব ; (৩) মতের দাসত্ব উদ্ভূত হয় ; (৪) যুদ্ধ প্রভৃতির সময় শক্তি কেন্দ্রীভূত না থাকিলে কার্য্য সুনির্ব্বাহ হয় না ; (৫) নির্ব্বাচনকারিগণের মন রক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন অসম্ভব হয়। নির্ব্বাচন-প্রথার এই সকল দোষ গণতন্ত্রে বিদ্যমান। কিন্তু স্বাভাবিকতায় ভারতীয় সমাজে ইহার স্থান হয় নাই। রাজা রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষবিধানার্থ প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নীকেও বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জ রামচন্দ্রের অনুরক্ত জানিয়া এবং রামচন্দ্রই প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ের প্রকৃত রাজা জানিয়া ভরত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই ; রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নীবিসর্জ্জনের মত দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। রাজশব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীয়মান হয়, রাজা প্রজার প্রতিভূ। “অনুরঞ্জনাৎ রাজা” এই বাক্য সার্থক। ইহা অপেক্ষা গণতন্ত্রের আদর্শ কি শ্রেষ্ঠ ? ইউরোপে গণতন্ত্র ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ কিছুই দেখাইতে পারে নাই। ইউরোপে politics অর্থ রাজনীতি, রাজধর্ম্ম নহে ; আর ভারতের রাজশাসন রাজধর্ম্ম। এই দুইটি জিনিষের উপাদান ও

আদর্শ অত্যন্ত বিভিন্ন। ইউরোপে গণতন্ত্রই হউক, রাজ-তন্ত্রই হউক, অথবা যথেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্রই হউক, কোনটিই কোথাও ধর্ম্মের আকার ধারণ করে নাই। রাজা যে সমাজের প্রতিভূ, তাহা রাজার শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপনেও প্রমাণিত হয়।* রাজা নিজের ধনা-গারাদির অধিকারী নহেন। রাজা ন্যস্তধনের রক্ষক মাত্র। রাজা প্রজার পাপপুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি প্রজার প্রতিভূ। বিষ্ণুধর্ম্মসূত্র বলিয়াছেন, —রাজা প্রজার পাপপুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী। "রাজা চ প্রজাভ্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতষষ্ঠাংশভাক্।" (৩।১৪)। রাজা রক্ষক বলিয়াই প্রজার পাপপুণ্যের অংশী। তিনি প্রতিভূ বলিয়াই প্রজার রক্ষার জন্য কর গ্রহণ করিতেন। প্রজা-রক্ষার্থ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ ভাগ তাঁহার। "আদানং হি বিসর্গায়" এই কবিবাক্য ইহার সমর্থক। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন,—"গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।" আপনি গণদাস। আপনি দেশের লোকের ভৃত্য, ছয়ভাগের একভাগ আপনার মাহিয়ানা; আপনার এত গর্ব্ব কেন? এই ভাষায় যদিও রাজাকে চাকর বলিয়া তাচ্ছীল্য করা হইয়াছে,

* মনু ৭ম অ, ৩৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তথাপি রাজা যে সর্ব্বসাধারণের প্রতিভূ, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হয়। রাজাকে গণদাস (public servant) বলা পঞ্চম শতাব্দীতেও দেখা গেল। প্রাচীন ভারতে রাজাকে বর্ণাশ্রমের প্রতিভূ বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় গণতন্ত্র জিনিষটা ইউরোপের আমদানী, ইহা বলা যায় না। তবে ইউরোপের নির্ব্বাচনপ্রথা সে ভাবে ভারতে ছিল না। স্বাভাবিক ধর্ম্মবলে সুসম্পন্ন হইত বলিয়াই ভারতীয় নির্ব্বাচনপ্রথা ইউরোপের আকার ধারণ করে নাই। ইউরোপে সামাজিক চুক্তিবাদের উপরে রাজার শাসন নিয়ন্ত্রিত। উহার অর্থ এই—রাজা ও প্রজার মধ্যে একটা চুক্তি আছে; যে রাজা যথাযথ নিয়ম পালন করিবেন, তিনি রাজপদবাচ্য, আর অন্যথাচরণ করিলে তিনি রাজা নহেন। এই মতবাদের উপরেই প্রথম চার্লস্, ষোড়শ লুই ও মেরী এণ্টনেটের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। চিন্তাশীল, দেশপ্রাণ ৺ভূদেববাবু তৎপ্রণীত—"সামাজিক প্রবন্ধে" লিখিয়াছেন, "ইউরোপীয় প্রণালী কাল্পনিক চুক্তিমূলক বলিয়া উহার অভ্যন্তরে এই অতথ্যটীর সঞ্চার হইয়াছে যে, কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত, লোকমাত্রেই অতি গরিষ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনেও মতামত প্রদান করিতে সক্ষম ও

অধিকারী। এই অতথ্য ইউরোপের সকল দেশেই সংক্রামিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতে এই মৌলিক দোষ থাকায় উহা অতিশয় বিপ্লব-প্রবণ হইয়াছে।” বাস্তবিক এই কথার সারবত্তা আছে। চুক্তি থাকিলেই লোক সহজে ক্ষেপিয়া উঠে, ন্যায্য পাওনা বলিয়া ব্যাকুল হইয়া আদায় করিতে ব্যস্ত হয়, পক্ষান্তরে ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি ক্ষমতা ত্যাগ করিতে নারাজ, তাই সজ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। ভারতে চুক্তিপ্রথা ছিল না, ছিল বিধিপালন। বিধিপালনই প্রাকৃতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী দার্শনিক কোম্‌টে (Auguste Comte) সমাজ রক্ষার জন্য ধর্ম্মশাসনের প্রাধান্যের নিতান্ত পক্ষপাতী। এই সম্বন্ধে তাঁহার মতের সারাংশ এই—

“ধারণা, রীতিনীতি, আচারব্যবহার ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজরক্ষক অংশগুলির পরস্পর সাহচর্য্য-সম্বন্ধ সামাজিক স্থিতির অন্তরে বিরাজিত। যাহা স্বাভাবিক সাহচর্য্যের ফলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কোনরূপ বলপ্রয়োগ করিতে হয় নাই, তাহাকে নিয়মিত করাই কেবল প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য। স্বতঃপ্রবৃত্ত উন্নতির তুলনায়, আইন ও রাষ্ট্রের আবশ্যকতা অতি

রাজনীতি।

নিম্নে এবং নিয়ম বা আইনের জ্ঞান-কর্ত্তব্যবোধ হইতে অতি নিম্নে।”

বর্ত্তমান ইউরোপ রোমসাম্রাজ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। রোমসাম্রাজ্যের পতনের সহিত ইহার উত্থান। রোমক শাসনপ্রণালী, রোমক আইন ইউরোপ গ্রহণ করিয়াছে। রোমসাম্রাজ্য জয় করিয়া সেই বিজিত জাতির ধর্ম্ম ইউরোপে কেল্টিক্ ও টিউটনিক্ জাতি গ্রহণ করিয়াছিল। বিজিত জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাহারা তাহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের অনুশাসনকে বড় বলিয়া গ্রহণ করিতে ইউরোপ নারাজ। জর্ম্মন দার্শনিক নিট্‌শে খৃষ্টান ধর্ম্মকে মানবজাতির কলঙ্কস্বরূপ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইউরোপের প্রকৃতি ভারতীয় প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। দুইটি ধারা দুই দিক্ দিয়া প্রবাহিত ;—একটি সাত্ত্বিকতার জন্য স্থির, আর একটি রাজসিকতার জন্য চঞ্চল। একটি অন্তর্জগৎকে আয়ত্ত করিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, অন্যটি বহির্জগতের সকল শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। প্রাচীন ভারতে স্বাধীনতায় সাত্ত্বিক ভাব পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু পরাধীনতার সহিত তামসিকতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। ইউরোপের

রাজসিকতায় ইউরোপকে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সাত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি পরাধীন হইলেই তামসিকতা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। রাজসিক ভাবাপন্ন পরাধীন হইলেও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইতে লালায়িত। রাজসিকতায় এই সুবিধা আছে। প্রাকৃতিক ভিন্নতার জন্যও ভারতীয় আদর্শ ইউরোপীয় আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। ইউরোপ সাত্বিকতাকে দুর্ব্বলতা মনে করে এবং ভারত রাজসিকতাকে দস্যুতা মনে করে। এই প্রাকৃতিক বিভিন্নতার জন্যও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা উভয়ের কতক পরিমাণে ভিন্ন।

মন্ত্রী—ভারতীয় শাসনে মন্ত্রি-গ্রহণের আবশ্যকতা সবিশেষ স্ফুট। মন্ত্রীর পরামর্শানুসারেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। সাত জন বা আট জন সচিব লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহা ব্যতিরেকে সভাসদ্ সকল থাকিত। সভাসদ্গণ মহাসভার সদস্য (Parliamentary members)। মন্ত্রীর গুণাবলী সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—সচিব শিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ, মনীষাসম্পন্ন হইবে। সচিবগণই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসক ছিল। মহাভারতে সচিবের গুণ সকল আলোচিত হইয়াছে। সচিব কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অক্ষুদ্রচেতা,

দৃঢ়ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিনিপুণ হওয়া আবশ্যক। * মন্ত্রী সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"স মন্ত্রিণঃ প্রকুর্ব্বীত প্রজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন্।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েৎ রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বয়ম্॥"

মনু বলিতেছেন,—

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্ভবান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা কুর্ব্বীত সুপরীক্ষিতান্॥৭।৫৪

এই সাত বা আট জন সচিব লইয়াই মন্ত্রণা-সভা। ইহাই ইউরোপীয় cabinet. এই মন্ত্রণা-সভার উপরেই কার্য্য ন্যস্ত। মন্ত্রি-সমাজের সহিত পরামর্শ করিয়াই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রকার দিয়াছেন। মনু বলিতেছেন,—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥" ৭।৫৬

অর্থাৎ মন্ত্রিগণের সহিত সর্ব্বদা সন্ধি, বিগ্রহ, কোষ, পুর প্রভৃতি রক্ষা, অর্থসংগ্রহ, রাজ্যরক্ষা, সম্মানিত

---

* কৃতজ্ঞং প্রাজ্ঞমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ধর্ম্মনিত্যং স্থিতং নীত্যাং মন্ত্রিণং পূজয়েন্নৃপঃ॥—মহাভারত।

ব্যক্তিগণের সম্মানাদি সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে। মন্ত্রিগণের পরামর্শ ব্যতীত কার্য্য করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ একান্ত প্রয়োজনীয়। নিজের বুদ্ধি সুখকরী হইলেও গুরুবুদ্ধি আরও শুভকরী। "আত্মবুদ্ধিঃ সুখকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।" তাই মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিদ্বান্‌গণের সহিত বিচার না করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না। পূর্ব্বে তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে, তৎপরে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। মনু বলিতেছেন,—

"সর্ব্বেষাং তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্‌গুণ্যসংযুতম্॥৭।৫৮
নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্ব্বকার্য্যাণি নিক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥" ৭।৫৯

মন্ত্রীদের হস্তে কার্য্য ন্যস্ত করিতে হইবে, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। এই বিধান অনুসারে কার্য্য করাতেও রাজার যথেচ্ছাচার নিবারিত হইত। বিশেষতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিরূপে মন্ত্রণাসভা জাতীয় তরণীর কর্ণধার।

সভাসদ্—ভারতীয় বিধানে সভাসদ্গণ বিচার ও শাসনকার্য্যের সহায়ক। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের সহিতই রাজা আইন প্রভৃতি প্রয়োগ ও প্রণয়নাদি সন্দর্শন করিবেন—ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। মনু বলিতেছেন,—

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্॥" ৮।১

পৃথিবীপতি ব্যবহার দর্শন করিবার মানসে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ও বিদ্বান্ মন্ত্রিগণের সহিত বিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই সভাসদ্। ইঁহারাই ব্যবহারশাস্ত্র বা ব্যবস্থাশাস্ত্রের মীমাংসক। ইঁহারা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ইঁহারাই কার্য্যের সমালোচক। ইঁহারাই মহাসভার সদস্য—Members of Parliament.

রাষ্ট্রীয় শাসনের আদর্শ—যথাশাস্ত্র শাসনের জন্য মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণের ঊর্দ্ধলোক লাভ হইয়াছে, ইহার বর্ণনা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ধর্ম্মের প্রেরণায় মন্ত্রী ও সভাসদের সহিত রাজকার্য্য সাধন করিয়া মুক্তিমার্গেরও অধিকারী হইতে দেখিতে পাই। কোন সময়ে রাজা মান্ধাতা রাজ্য ত্যাগ করিয়া

বনগমন-প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজ্যশাসনধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন, রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজারক্ষা করিতে নিয়োজিত করিলেন। ইন্দ্র স্পষ্টই বলিলেন যে, রাজ্যশাসন হইতে মান্ধাতা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবেন। ভগবানের প্রীতির জন্য রাজ্যশাসন বিহিত হইলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে,—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"। রাজ্যশাসন পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায়, মুক্তির সোপান। ইহার তুল্য ধর্ম্ম বিরল। ইহা অপেক্ষা রাজ্যশাসনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কি হইতে পারে? রাজ্যশাসন ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ বোধহয় অন্য কিছুই হইতে পারে না। রাজ্যশাসন নারায়ণের পূজা। এই ভাব ইউরোপে নাই; ইউরোপ দেশপ্রাণতায় অগ্রণী হইলেও, এইরূপ মহান্ আদর্শ স্থাপন করিতে পারে নাই।

রাজগুণ—রাজোচিত গুণাবলীর আলোচনা করিলে তাহা হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। শঙ্খলিখিত বলিয়াছেন,

রাজনীতি।

—"রাজার দীর্ঘদর্শী, মহোৎসাহসম্পন্ন, শক্তিমান্, অসূয়াপরিশূন্য, ভক্তবৎসল, ত্যাগী, শরণাগতের আশ্রয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, সত্যবাদী, অনহঙ্কারী, গম্ভীর, অমর্ষণ, পণ্ডিত, তেজস্বী, প্রতিবিধানকুশল, অদীর্ঘসূত্র, দক্ষ, ক্ষমাবান্, লক্ষ্যজ্ঞ, দেশ কাল দ্রব্য প্রভৃতি প্রয়োগ ও সংগ্রহে কুশল এবং নিমিত্তজ্ঞানে কৌশলী, গূঢ়মন্ত্র, নিজ-রাজ্যের দোষসংগোপনে তৎপর, পররন্ধ্রজ্ঞ, দৃঢ়প্রহারী, লঘুহস্ত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, জিতকাম, জিতক্রোধ, জিতরাগ, জিতলোভ, প্রজাভিরাম, দীনানুগ্রহকর্ত্তা, বিদ্বান্‌গণের (ব্রাহ্মণগণের) অন্নপ্রদাতা, শ্রী ও যশঃপ্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল গুণশালী ব্যক্তি রাজপদযোগ্য। "প্রজাভিরাম" শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, জনপ্রিয় না হইলে কেহই রাজপদযোগ্য হইতে পারেন না। "প্রজাভিরাম" শব্দটি হইতে কোন মধুর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সুখপ্রিয় বিলাসী ব্যক্তিই অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী হয়। আলস্য দোষের আকর। অলস ব্যক্তিই অত্যাচারী হয়। আওরংজেব অনলস ও অবিলাসী হইয়াও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের মূলে ধর্ম্মান্ধতা ও অবিশ্বাস ছিল। এইরূপ দুই একজনকে

বাদ দিলে, অধিকাংশই বিলাসের দাস হইয়া অত্যাচারী হয়। তাই মৎস্যপুরাণে রাজাকে অনলস হইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"অদীর্ঘসূত্রশ্চ ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পার্থিবঃ।
দীর্ঘসূত্রস্য নৃপতেঃ কর্ম্মহানির্ধ্রুবং ভবেৎ॥"

রাজার পক্ষে অদীর্ঘসূত্রতাই প্রশংসনীয়। অনলস হইয়া কার্য্য করাই বিহিত। কিন্তু কার্য্যবিশেষে দীর্ঘসূত্রতা প্রশস্ত। যেমন,—

"দোষে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রঃ প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ দোষ, অহঙ্কার, অভিমান, দ্রোহ, পাপকর্ম্ম এবং অপ্রিয় কর্ত্তব্যে দীর্ঘসূত্রতা প্রশস্য। গৌতম রাজগুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"রাজা সাধুকারী, সাধুবাদী, বেদবিৎ, ন্যায়বিৎ, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, গুণবান্, সহায়-সম্পন্ন, সমস্ত প্রজাতে সমজ্ঞানবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা প্রজাহিতে তৎপর হইবেন।" সমস্ত প্রজাতে সমভাব-সম্পন্ন না হইলে রাজা রাজপদবাচ্য হইতে পারেন না। প্রজাতে সমজ্ঞান ও প্রজাহিত-তৎপরতা রাজার শ্রেষ্ঠ গুণ।

রাজনীতি।

রাজগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন,—

"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥"

অর্থাৎ রাজা বেদবিদ্‌গণের নিকট হইতে বেদশিক্ষা করিবেন; দণ্ডনীতি, ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন; লোকবার্ত্তায় পারদর্শী হইবেন এবং আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানতৎপর হইবেন। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো রাজাকে অধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞানবাদে অনভ্যস্ত ব্যক্তি রাজা হইবার উপযুক্ত নহে। ভারতেও মনু রাজাকে আত্মবিদ্যা লাভ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাস্তবিক রাজা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে শাসন-শৃঙ্খলা শোভন হইতে পারে। আত্মজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইতে পারে না, সকল প্রজায় সমদর্শী হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব।

আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনই যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। মনু ইন্দ্রিয় জয়ের নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিতে বিধান দিয়াছেন। কারণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রজাসকলকে বশে রাখিতে সক্ষম।

কাত্যায়নও রাজাকে প্রজাপীড়নবর্জ্জিত স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইবার বিধান দিয়াছেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারই রাজগুণ সম্বন্ধে একমত। শাস্ত্রকারগণ রাজার গুণাবলী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রাজার পক্ষে যথেচ্ছাচার অসম্ভব। রাজার অন্যান্য গুণের সহিত অপর একটি বিষয়েরও অবতারণা আবশ্যক। নিজের ছিদ্র পরকে জানিতে দিবে না, কিন্তু পরের ছিদ্র সর্ব্বতোভাবে জানিবে। মনু বলিয়াছেন,—

"নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাদ্ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ॥" ৭।১০৫

অর্থাৎ নিজের ছিদ্র পরকে জানিতে দিবে না, কিন্তু পরের ছিদ্র সর্ব্বতোভাবে জানিবে। কূর্ম্মের ন্যায় নিজ শরীরের অঙ্গ সংগোপন করিবে এবং আপনার আশ্রয়স্থান রক্ষা করিবে।

প্রত্যেক রাজার এই বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালন করাই রাজনীতি।

রাজ্যাধিকারী—ভারতে ক্ষত্রিয়ই রাজ্যের মুখ্যাধিকারী। ক্ষত্রিয় স্বাভাবিক নিয়মেই রাজ্যের

রক্ষক। মনু বলিতেছেন,—ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানা-মেবপালনম্” অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম প্রজাপালন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—“চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ” অর্থাৎ সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ ও যজন, যাজন, প্রজাপালন প্রভৃতি কার্য্যের বিভাগ অনুসারে আমি চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধেও ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

“শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥” ১৮।৪৩

অর্থাৎ শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা তাহার সহজাত। রাজোচিত গুণসকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত। মনুও “রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ” এই বলিয়া রাজধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজশব্দে কাহাকে বুঝাইবে, তাহার আলোচনা আবশ্যক। যে কেহ প্রজাপালন করে, তাহাতেই কি রাজশব্দ প্রযোজ্য অথবা ক্ষত্রিয়জাতিতে, অথবা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়জাতিতে বা গৌণভাবে

অভিষিক্ত অন্য জাতিতে ? "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্য-কামো যজেত" এই শ্রুতিবাক্য রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষ্যে দৃষ্ট হয়। এ স্থলে রাজশব্দে ক্ষত্রিয়কে বুঝাইয়াছে। কারণ, রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার এবং বাজপেয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার। মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদে "অবেষ্টৌ যজ্ঞসংযোগাৎ ক্রতু-প্রধানমুচ্যতে" (৩য় সূত্র) একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শবরস্বামী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" এই বাক্যের রাজশব্দ ক্ষত্রিয়বাচক। বার্হস্পত্যযজ্ঞে যেরূপ ব্রাহ্মণের অধিকার, অন্য কাহারও নহে, সেইরূপ, রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। আচার্য্য শবরস্বামী সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন,—"তস্মাজ্ জাতিনিমিত্তো রাজ-শব্দ"। আচার্য্য কুমারিলভট্টও তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ মনুও "রাজ-ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি" এই বলিয়া জনপদ পরিপালনরূপ রাজ্যের মুখ্যাধিকারী ক্ষত্রিয়—ইহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥" ৭।২

অর্থাৎ বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয় যথাশাস্ত্র ন্যায়ানুসারে সকলকে রক্ষা করিবে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—(১) "ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানাং পরিপালনম্" (২) "ক্ষত্রিয়স্যাপরাধেন ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা" (৩) "বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাভি রক্ষণম্" (৪) "ক্ষত্রিয়ায় দদৌ রাজ্যম্"; এই সকল বাক্য হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, ক্ষত্রিয় রাজ্যের মুখ্যাধিকারী। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও "দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ এই তিনটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং পৃথিবীরক্ষা ও অস্ত্র-পরিচালন উহার জীবিকা" ইহা কথিত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, "প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্"। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম প্রজাপালন। আচার্য্য পাণিনিও "রাজ্ঞঃ কর্ম্মণি ষ্যঞ্" এই অর্থে 'গুণবচনে ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" অথবা "পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্" এই সূত্র দ্বারা 'রাজ্য' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে রাজার কর্ম্ম রাজ্য, এই অর্থে মনুর সহিত একবাক্যতাই হয়; এবং "রাজশ্বশুরাদ্যৎ" ও "রাজ্ঞোঽপত্যে জাতৌ" ইত্যাদি সূত্র ও বার্ত্তিকবলে রাজশব্দ দ্বারা ক্ষত্রিয়কেই বুঝাইতেছে। "রাজানম-

ভিবেচয়েৎ” এই বাক্যে অভিষেক ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই মুখ্যরূপে বিহিত।

মনু “ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ” ইহা বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, শূদ্রের রাজ্যাধিকার প্রশস্ত নহে। উচ্চবর্ণ বিপদের সময়ে নিম্নবর্ণের কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, কিন্তু নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের কার্য্য করিতে পারিবে না, মনু স্পষ্টরূপে ইহা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্রের রাজ্যাধিকার প্রশস্ত নহে বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বৈশ্য প্রভৃতির শাসন মঙ্গলজনক হইতে পারে না; অর্থগৃধ্নু বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের মহত্ত্ব শূন্য হয়। রাজ্য পরিচালনে যে মহত্ত্বের আবশ্যকতা, তাহা বৈশ্যে থাকে না। কেবল শিক্ষাবলেই রাজা তৈয়ারী হইতে পারে না, চরিত্রবলই প্রধান অবলম্বন। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয়ই রাজ্যের মুখ্যাধিকারী, গৌণরূপে ব্রাহ্মণও অধিকারী। কারণ, মনু বলিয়াছেন,—

“অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥”

ক্ষত্রিয় হইলেই রাজ্যাধিকারী নহেন; অভিষিক্ত হওয়া চাই। অভিষেক প্রজার মনোনয়ন বা নির্ব্বাচনের

দ্যোতক। রাজা অভিষিক্ত না হইলে রাজপদবাচ্য নহেন। নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, বালক-প্রৌঢ়-কিশোর—সকলেই রাজাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিষিক্ত করিবে, ইহা অপেক্ষা মনোনয়নের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কি হইতে পারে? ইহার জন্য ভোটের দরকার নাই, canvassingএরও দরকার নাই। ইহা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সহজ স্বাভাবিক ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, উহাতে হৃদয়ের আন্তরিকতা থাকিত, প্রাণস্পর্শী ভাব থাকিত। অন্তঃসারশূন্য লোক দেখান অস্বাভাবিক ভাক্ত ভক্তি থাকিত না, চুক্তি করিয়া ভোট দেওয়া থাকিত না, "electioneering dodge"—পরের অযথা নিন্দাও থাকিত না। যৌবরাজ্যে অভিষেকের সহিত রাজোচিত গুণগ্রামে সকলকে মুগ্ধ করিতে পারিলেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজরূপে অভিষিক্ত হইত।

ক্ষত্রিয় মুখ্য অধিকারী, ব্রাহ্মণ গৌণ; বৈশ্য ও শূদ্রের শাসন প্রশস্ত নহে। বৈশ্যের শাসন Timocracy বা ধনশালীর শাসনতন্ত্র। বৈশ্যের শাসন কখনই শোভন হইতে পারে না। বণিগ্‌ভাব রাজশাসনে সঞ্চারিত হইলে রাজধর্ম্ম নিকৃষ্ট অর্থগৃধ্নুতায় পর্য্যবসিত হওয়া অনিবার্য্য। বোধহয়, ইংরেজের বণিগ্‌ভাব-

প্রবণতা দেখিয়া নেপোলিয়ান ইংরাজজাতিকে দোকান-দারের জাতি "A nation of shop-keepers" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। আমেরিকার মার্কিণের রাষ্ট্রনায়ক উড্রো উইলসন্ (Wilson) নায়ক হইবার সময় বলিয়াছেন, যুক্তরাজ্যের ধনশালী ব্যক্তিগণই শাসনযন্ত্র একচেটিয়া করিতেছে। তাহারা ধনবলে তুর্ব্বলকে পেষণ করিতেছে।

আমেরিকার উপাস্য "King Dollar"। মার্কিণ মুলুকে অর্থশালীই প্রকৃত শাসক। যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্র অনেকটা পরিমাণে Timocracy বা বৈশ্য-শাসনতন্ত্র। বৈশ্য-শাসনের বিভীষিকা দর্শন করিয়াই নায়ক উইল্-সন্ জাতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ক্ষাত্রবীর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি যত উদার হয়, ধনশালী বৈশ্য কখনই তত উদার হইতে পারে না। ধর্ম্মজগতে যিশুর শিষ্য জুডাশ্ অর্থলোভে গুরুর প্রাণহত্যার সহায় হইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অর্থে অনেক সময় স্বভাবের বিপর্য্যয় হয়। অর্থশালীর শাসন পেষণের নামান্তর। প্রাচীন ভারতে বৈশ্যের শাসন-নিষেধের মূলে এই অন্তর্নিহিত সত্য। জাতির মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য, পদ শূদ্র। পুরুষসূক্তের বিরাট পুরুষই জাতির অন্তরাত্মা।

এই ভাবের ভিতরে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের Land, Labour, Capital,—ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধনের সহিত Intellect বা বুদ্ধি যোগ দিলে এই চারি জাতি-সন্নিবেশ পরিস্ফুট হইবে। ক্ষত্রিয় Land বা ভূমি, বৈশ্য Capital বা মূলধন, শূদ্র Labour বা পরিশ্রম এবং ব্রাহ্মণ Intellect বা বুদ্ধি। এই চারির সমাবেশে সমাজ অবাধ গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। দানের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তন্নিম্নে প্রাণদান বা প্রাণ রক্ষা, তন্নিম্নে অন্নদান ও তন্নিম্নে শারীরিক সেবা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানদান করেন, তাই ব্রাহ্মণ জাতীয় শরীরের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক যেমন শরীরের স্নায়ুমণ্ডলের জ্ঞানাধার, সেইরূপ ব্রাহ্মণ সমাজশরীরের মস্তিষ্ক। বাহু ক্ষত্রিয়। বাহু বলিতে উপলক্ষণে হৃদয়কে গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ই জাতির—সমাজের হৃদয়। ব্রাহ্মণের কার্য্য—জ্ঞান। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বা কর্ম্ম; হৃদয়ই তাহার স্থান। কেবল মস্তিষ্ক দ্বারা শরীর বিধৃত হইতে পারে না; শরীরের সকল অঙ্গ লইয়া শরীর। সঙ্ঘাতের সকল অংশের প্রয়োজনীয়তা আছে। হৃদয় ও প্রাণ সরলভাবে শরীর ধারণ করিয়া রাখে,

কার্য্য নির্ব্বাহের প্রধান কারণ প্রাণ ও হৃদয়। মস্তিষ্কের সাহায্যে হৃদয় ক্রিয়া করে। সমাজে হৃদয়স্বরূপ ক্ষত্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মস্তিষ্করূপ ব্রাহ্মণ মন্ত্রণা প্রদান করেন। কেবল মস্তিষ্কের শাসন নীরস, এজন্য হৃদয়ের যোগও আবশ্যক। মস্তিষ্কের শাসন হয় কঠোর, না হয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ক্ষত্রিয় হৃদয়, প্রাণ, বাহু অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ। যেমন কোমলতা, তেমন কঠোরতা ; যেমন ভাবপ্রবণতা, তেমন কর্ম্মকুশলতা ; শরীরের মধ্যভাগই কর্ম্মের আশ্রয়।

রাষ্ট্রই সমাজের প্রাণ। এই সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াই ক্ষত্রিয় রাজ্যাধিকারীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিয়াই সমাজ বিধৃত রাখে। গৌতম বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মপ্রসূতং হি ক্ষত্রমৃধ্যতে ন ব্যথতে ইতি চ বিজ্ঞায়তে। ব্রহ্ম-ক্ষত্রেণ সম্প্রবৃত্তং দেবপিতৃ-মনুষ্যান্ ধারয়তীতি বিজ্ঞায়তে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়াই ক্ষত্রিয় সমৃদ্ধ হন, কিন্তু ব্যথিত হন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিয়াই দেবপিতৃমনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন,—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রং চ সংপৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" ৯।৩২২

ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি পাইতে পারেন না এবং ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণও সমৃদ্ধ হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংপৃক্ত হইলেই ইহলোকে ও পরলোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বাস্তবিক ক্ষত্রিয়শূন্য ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ অধঃপতিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়শক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণের অধঃপতন অনিবার্য্য। উভয়ে মিলিত হইলেই সমাজের গতি অবাধ হয়, জাতীয় জীবনের উন্মেষ হয়। ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যে বলিতেছেন,—"তেন যোগবলেন যুক্তাঃ সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুম্। ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্॥" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া সেই যোগবলে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়-পরিরক্ষিত হইলে সমস্ত জগৎ পরিপালনে সমর্থ হন। "Head and Heart"—মস্তক ও হৃদয়ের সম্মিলিত শাসনই প্রকৃত শাসন। সমাজশাসনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিলনই সুশৃঙ্খলার মূল। অতএব ক্ষত্রিয়ের রাজ্যাধিকার প্রাকৃতিক নিয়মে সুসিদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্যটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হইলেই হৃদয়ের বলসম্পন্ন

ব্যক্তি রাজা এবং মস্তিষ্কের বলসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মন্ত্রী ও সভাসদ্। ইহা অপেক্ষা শোভন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। শাসনযন্ত্র পরিচালনের উপযোগী উপকরণ বৈশ্য ও শূদ্র। প্রত্যেক অঙ্গ নিজস্ব অধিকারে স্বাধীন। প্রত্যেক অঙ্গের আবশ্যকতা আছে। পূর্ণ শরীরে কোনও অঙ্গ বাদ থাকিতে পারে না। উরু ও পদের আবশ্যকতা সমধিক। পূর্ণ শরীরই বাঞ্ছনীয়। মস্তিষ্ক ও হৃদয় পরিচালক হইলেও উরু ও পদের একান্ত আবশ্যকতা আছে। অন্যথায় অঙ্গহীন শরীর কিয়ংপরিমাণে অকর্ম্মণ্য হয়। মানসিক-বল হীন ব্যক্তির হস্তে শাসন নিয়োজিত হইলে তাহা মঙ্গলের নিদান হইতে পারে না। তাই মনু বলিয়াছেন,—"ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ।" মস্তিষ্কের শাসনের দোষ নীরসতা। মস্তিষ্ক বলিতেছে, অপরাধীকে শাসন কর। কিন্তু হৃদয় বলিতেছে, দয়ার দ্বারা ন্যায়বিচার অনুরঞ্জিত হউক। ব্রাহ্মণশাসনের দোষই—হয় অতিরিক্ত শাসন, না হয় শাসনের ঐকান্তিক অভাব। বিচারের সহিত হৃদয়ের মিলন সাধিত না হইলে তাহা একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ আইন প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্-

বিবাক্‌রূপে (প্রধান বিচারক) আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, আবার সভাসদ্‌রূপে বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব অবধারণ করিলেন; রাজা তাহার প্রয়োগ করিলেন। এইরূপে শাসনযন্ত্র উভয়ের মিলনে পরিচালিত হইল। রাজা ব্যবহার-দিদৃক্ষু হইয়া মন্ত্রী ও সদস্য-সমভিব্যাহারে সভায় প্রবেশ করিতেন। সভাসদ্‌গণ বিচারকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের অধিকারী। রাজকার্য্যে সমালোচনার অধিকার ভারতীয়-বিধানে সুপরিস্ফুট। তাই মনু বলিয়াছেন,—

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
* * * প্রবিশেৎ সভাম্॥" ৮।১

সভাসদ্‌গণ জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রতিনিধি। ধর্ম্মরক্ষার জন্যই সভাসদ্‌গণ রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাই সভাসদের ধর্ম্ম। প্রজার প্রতিনিধিরূপে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সদস্যের প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের এই অনুপ্রাণনায় বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের মন্ত্রী; ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাদাতা; নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় প্রজার কুশলজিজ্ঞাসু; যিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি রাজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে তৎপর।

এই স্বভাবদত্ত অধিকারের দ্বারা রাজার যথেচ্ছাচার নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আইন রচনা করিতেন প্রজার প্রতিনিধি, প্রয়োগ করিতেন রাজা; প্রয়োগের দোষগুণ বিচার করিতেন প্রতিনিধি। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে জরাসন্ধের অত্যাচার ও শিশুপালের মদমত্ততা নিবারণের চেষ্টা ঐ অধিকারের পরিপোষক প্রমাণ। রাবণের অত্যাচার নিবারণ করিতে রামচন্দ্রের জন্ম। সকলই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশের একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। "স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্" লোকস্থিতির জন্যই দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণকে দণ্ড প্রদত্ত হইত। শান্তির জন্যই শাস্তি। শাস্তির জন্য শাসন নহে। দণ্ড প্রদানের মূলেও শান্তি-স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। প্রজার সন্তোষ-বিধানই শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম। এইজন্যই বিষ্ণুস্মৃতিতে দেখিতে পাই,—

"প্রজাসুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিতঃ।
স কীর্ত্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥"

অর্থাৎ যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং প্রজার দুঃখে দুঃখী, সেই রাজাই ইহলোকে কীর্ত্তিমান্ ও স্বর্গলাভে সমর্থ। বাস্তবিক এই মহান্ আদর্শের উপরেই রাজ-

শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। প্রজার প্রতিনিধিরূপে রাজা প্রজার স্বার্থকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা ও প্রজার স্বার্থ অভিন্ন ছিল। প্রজার হৃদয়ে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। প্রজার মঙ্গল বিধানই রাজনীতি, তাহাই রাজধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় মতবাদ।

ইউরোপে জর্ম্মন্‌দেশে ফিলিপ্‌ মেলান্স্‌থন্ (Philip Melanchthon) "Liber de Anima" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি "Natural Light" বা স্বভাবজাত আলোকের বিষয় প্রতিপন্ন করেন। স্বাভাবিক আলোক আমাদের সহজাত ভগবদ্দত্ত ধারণা-সমূহ। এই সহজভাব মূল করিয়াই জন্‌ এল্‌থাস্‌ (John Althaus) গণতন্ত্রের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার মতের সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল।

এল্‌থাসের মত—এল্‌থাস্‌ এম্‌ডেনের বারগো-মাষ্টার বা মেয়র ছিলেন। তিনি 'সহজাত আলোক'কে ভিত্তি করিয়া তৎপ্রণীত পলিটিকা মেথডিকা ডিজেষ্টা নামক গ্রন্থে সাধারণতন্ত্রসম্বন্ধীয় মত স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে. জিন্‌বোডিন্‌ তৎপ্রণীত 'লা রিপাবলিক' নামক পুস্তকে "রাজশক্তি অবিভক্ত, তাই কোনও বিশেষ স্থলে সংবদ্ধ হইতে বাধ্য", এই মত উদ্ভাবিত ও প্রপঞ্চিত করেন। এল্‌থাসের মতে রাষ্ট্র প্রজার

সম্পত্তি, বা রাষ্ট্রশক্তিই প্রজাশক্তি। শাসনকর্ত্তা আসে যায়, কিন্তু জনসাধারণ রাজ্যের চিরস্থায়ী ভিত্তি। জনসাধারণই সকল শক্তির মূল। কারণ তাহাদের মঙ্গল-বিধানেই রাষ্ট্রের তাৎপর্য্য পরিসমাপ্ত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রজাশক্তিই রাজশক্তি। কারণ, অনেক রাজ্যেই কতকগুলি কর্ম্মচারী সাধারণের অভিমতে বহাল হইয়া শাসনযন্ত্র পরিচালন করে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক স্থলে জনসাধারণ অত্যাচারী রাজার শাসন, বিপ্লবের সাহায্যে বিধ্বস্ত করে। পক্ষান্তরে, দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রজাই রাজশক্তি। প্রকাশ্য বা মৌন চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণই রাজশক্তি। এইরূপ চুক্তিবলেই জনসাধারণ সংহত ও সমাজবদ্ধ হয় এবং শাসনশক্তির নিকট অবনত হয়। তাঁহার মতে চুক্তির উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে—প্রজার মঙ্গল-বিধানই চুক্তির উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে এই চুক্তি একটা ঐতিহাসিক সত্য নহে। ইহা অধিক পরিমাণে একটা পরিচালক আদর্শ বা ধারণা। রাষ্ট্র অতি ব্যাপক সমাজ বা সঙ্ঘ। ইহা পরিবার প্রভৃতির উত্তরাভি-ব্যক্তি।

এল্‌থাসের মতের সমালোচনা—এল্‌থাসের মত আলোচিত হইবার যোগ্য। প্রথমতঃ, সহজাত আলোক বা Natural Light জিনিষটি কি? প্রত্যেক মানুষ সহজভাবে স্বাধীন, রাজকার্য্যের সম্বন্ধে মতামত প্রদানে সক্ষম ও অধিকারী। কিন্তু ইহা সত্য কি? ব্যষ্টিভাবে ধরিলে প্রত্যেক পরিবারেই একজন কর্ত্তা আছে, অন্যান্য সকলে তাহার অধীন। পরিবারেও সকলে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম ও অধিকারী নহে। পরিবারেও নানা ব্যক্তির নানারূপ কর্ত্তৃত্ব থাকে। এমতাবস্থায় পরিবারের প্রত্যেকেই স্বাধীন, এই কথা বলা যায় না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; এক্ষেত্রে, ভৃত্য প্রভুর অধীন। পরিবারেও সকলের অধিকার সমান থাকে না। সম্পত্তির তুল্যাধিকার কোনও দেশের আইনেই সিদ্ধ হয় না। সাম্যবাদী মুসলমানের উত্তরাধিকার-আইন স্ত্রী পুরুষের ভেদ রাখে নাই সত্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পুত্রের প্রাপ্য অংশ হইতে কন্যার প্রাপ্য অংশ কম। রাজ্যে প্রথম পুত্রের অধিকার। প্রথমা স্ত্রীর প্রাধান্য মুসলমান সমাজেও বিদ্যমান। এই সাম্যবাদের ফলে মুসলমানগণের সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রে বিনষ্ট হইতে দেখা যায়।

খৃষ্টানসমাজেও রাজ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই অধিকার। গণতন্ত্রেও পুত্রকন্যার পিতৃধনে সমান অধিকার নাই। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক ভোটপ্রার্থিনীগণ কত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেও সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Franchise) নাই। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারও আয়ের উপর নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকিলে ভোটাধিকার নাই, ইহাতেও সার্ব্বজনীনতার সঙ্কোচ হইল। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও আছে। *

ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান। মহাসভার দুই অংশ—অভিজাত-সভা (House of Lords) এবং প্রজাসাধারণ-সভা (House of Commons)। জর্ম্মণির মহাসভায়ও অভিজাতদের (Bundesrath) এবং সাধারণের (Riechstag) সভা আছে। ইউরোপীয় সাম্যবাদ নগ্নমূর্ত্তিতে ঔপনিবেশিক ও বিজিত জাতির শাসনতন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অধিকারের তারতম্য থাকিলে স্বাধীনতারও

* বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের শাসনপ্রণালী অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জর্ম্মণির রাজতন্ত্র সাধারণ-তন্ত্রে, রুশিয়ার রাজতন্ত্রও সমাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। গ্রামে প্রত্যেক প্রতিবেশীর অধিকার সর্ব্বাংশে সমান নহে। সকলেই যদি স্বাধীন হইল, তবে ভৃত্যের স্থান কোথায়? কর্ম্মচারী বা দাঁড়ায় কোথায়? সৈনিকের স্থানই বা কোথায়? ভৃত্য তাহার ক্ষেত্রে স্বাধীন হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর নিকট সে অধীন। শিশু, পণ্ডিত, মূর্খ ও বৃদ্ধ—সকলের সমান অধিকার হইতে পারে না, অক্ষমের অধিকার কিরূপে সম্ভব? রাজকার্য্যে সকলে সমান অধিকারী ও সমানভাবে সমর্থ—ইহা কখনই সত্য নহে। জগতে বৈষম্য আছেই, থাকিবেও। বৈষম্যের উপর সাম্য দাঁড়াইতে পারে না; কোন দুইটী বস্তু সমান নহে। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। সুতরাং এই "স্বাভাবিক আলোক" অনেক পরিমাণে কাল্পনিক। কল্পনার উপরে মতের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মতটিও দোষদুষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয়, শাসনকর্ত্তা আসে যায়, কিন্তু প্রজা সর্ব্বদাই স্থির থাকে। বাস্তবিক ইহাও সঙ্গত নহে। যে অর্থে প্রজাসাধারণ স্থির (constant), সেই অর্থে শাসক বা রক্ষকও স্থির (constant)। একের সহিত অন্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জনসাধারণ থাকিলেই শাসক

থাকিবে, সঙ্ঘাত থাকিলেই রক্ষণশক্তি থাকিবে। শাসকের আসা যাওয়া যেরূপ, জনসাধারণের এক দল চলিয়া যাওয়া, অন্য দল আসাও সেইরূপ। শাসক মরিয়া গেলে অথবা অপসারিত হইলে নূতন শাসক তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। একটী শরীর চলিয়া যায়, অন্য শরীর তৎস্থান পূরণ করে। সাধারণেরও এক দল চলিয়া যায়, অন্য দল তৎস্থান পূরণ করে। সুতরাং এই মত অসমীচীন।

তৃতীয়, চুক্তিবাদ—পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি, মানুষ চুক্তি করে নাই, স্বাভাবিক ভাবেই রাজা বা নেতা গ্রহণ করিয়াছে। মৌনচুক্তি (tacit contract) মানিবারও উপায় নাই। কারণ, আদানপ্রদান প্রাকৃতিক ধর্ম্ম; রাজা, প্রজা, নেতা, জনসাধারণ, আদানপ্রদান সম্বন্ধবলে স্বাভাবিক ভাবেই আপন আপন কার্য্য করে। যে স্থলে নিক্তি-মাপা ভালবাসা, সে স্থলেই হিসাব দরকার, বুঝাপড়া করিতে হয়। যে স্থলে স্বাভাবিকতার অভাব, সেই স্থলেই চুক্তির কথা আসে। পিতামাতাকে ভক্তি করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে হয় না।

স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসার জন্য চুক্তির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইউরোপে বিবাহ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, ইউরোপ চুক্তিটাই বেশী বুঝে। প্রজাপালন

রাজধর্ম্ম। রাজভক্তি প্রজার ধর্ম্ম। ইহার জন্য চুক্তির আবশ্যকতা নাই। প্রজার মঙ্গল-বিধান রাজার ধর্ম্ম, উহা তাঁহার কর্ত্তব্য, উহা চুক্তির ফল নহে। চুক্তিবদ্ধ হইয়া প্রকৃত মঙ্গলসাধন অসম্ভব। শ্রদ্ধা মঙ্গলের নিদান। ইউরোপে রাজভক্তি জিনিযটাও চুক্তি। স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ হইতে কি চুক্তির আদর্শ শ্রেষ্ঠ? চুক্তির মূলে কল্পনা। চুক্তিতে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ হইতে পারে না। উহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির উন্মেষ রুদ্ধ হয়। মাতা সন্তানকে ভালবাসে; সে ক্ষেত্রে শিশুর সহিত মাতার চুক্তিবদ্ধ হইবার অবসর নাই। পিতা সন্তানকে পালন করে; সে ক্ষেত্রে চুক্তির কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশু পিতামাতাকে ভালবাসে। শিশু চুক্তির বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না; সে পিতামাতাকে স্বাভাবিক ভাবেই ভালবাসে। দার্শনিক এল্‌থাসের মতে রাষ্ট্র একটা ব্যাপক সমাজ এবং ইহার মূলে পারিবারিক সঙ্ঘ। তাহা হইলে পারিবারিক পিতাপুত্রের ভাব রাজাপ্রজায় সম্ভব হইবে না কেন? অতএব এল্‌থাসের মত এ অংশেও অসঙ্গত।

গ্রোসিয়াসের মত—গ্রোসিয়াসের মত কোন কোন অংশে এল্থাসের অনুরূপ, কোন অংশে ভিন্ন। গ্রোসিয়াস্ যুদ্ধকেই ভিত্তি করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি জনসাধারণের বিপ্লবের বিরোধী। এল্থাসের মতে জনসাধারণ বিপ্লবে অত্যাচারী রাজার শাসন বিধ্বস্ত করিতে পারে; কিন্তু গ্রোসিয়াসের মতে ব্যক্তিবিশেষ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, তাহা বিদ্রোহ। তাঁহার মতে জনসাধারণের বিপ্লব করিবার অধিকার নাই। * গ্রোসিয়াসের মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—"মানব মিলিত হয় ও সমাজ বন্ধন করে। ইহা তাহার সহজাত সামাজিক ভাবের অভিব্যক্তি। সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলেই মূলে শাসন-শৃঙ্খলা অবশ্য থাকিবে। সর্ব্বোপরি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অধিকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নাই এবং সেইজন্যই জনসাধারণ প্রকাশ্য বা মৌন-

---

* "When the individual declares war against the state, it is an act of rebellion; and in evident opposition to Althaus, Grotius denies the right of the people to revolt."

(Hoffding's Brief History of Modern Philosophy)

চুক্তির অনুবলে এই সকল নিয়ম মানিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। গ্রোসিয়াসের মতে প্রতিজ্ঞা-পালনের মূল কারণ আদিম প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার। এল্‌থাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গ্রোসিয়াসের সিদ্ধান্ত এই যে, জনসাধারণ আদিম-চুক্তির বলে সমাজ গঠন করিয়া শাসনভার কোনও রাজা অথবা সম্মিলিত সঙ্ঘের (corporation) হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে।"

গ্রোসিয়াসের মতের সমালোচনা।—গ্রোসিয়াস্ বিপ্লবের বিরোধী; কিন্তু অত্যাচারী রাজাকে দমন করিবার উপায় কি? যদি রাজা ও প্রজা চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং প্রজা যদি চুক্তিভঙ্গে শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে রাজা চুক্তি ভঙ্গ করিলে প্রজাসাধারণ তাঁহার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে না কেন? এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে অন্য পক্ষ তাহা নীরবে সহ্য করিবে কেন? বিপ্লবের ফলে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই হয়। সামাজিক বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নহে। আমরাও উহার বিরোধী। বহুদিনের স্বাভাবিক বিকাশের ফলেই সমাজ। এই সমাজকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা জীবহত্যার ন্যায় পাপ; কিন্তু অত্যাচারী হইলে সমাজ বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজাকে অপসারিত

করা সকল সময়েই অন্যায় হইতে পারে কি? বিশেষতঃ অত্যাচারে প্রপীড়িত দেশের পক্ষে এই মত আদৌ প্রযুজ্য হইতে পারে না। অত্যাচারিত জাতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিলে অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে কিরূপে? রাজার অত্যাচারে জাতীয়তা বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলাশাস্ত্র মলিন ও নিষ্প্রভ হয়; সমাজের বিকাশ রুদ্ধ হয়; তখন জাতীয় জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক নিয়মেও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পরিবর্ত্তন এক প্রকার বিপ্লব। বিপ্লবের সার্থকতাও আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবের চেষ্টা অধর্ম্মেও পরিণত হয়, তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম্মের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্যই অত্যাচারী রাজার শাসন বিধ্বস্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন,—

"প্রজাপীড়নসন্তাপসমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে॥"*

অর্থাৎ "প্রজাপীড়ন-জাত বিস্তৃত হুতাশন রাজার কুল, শ্রী ও প্রাণ দগ্ধ না করিয়া নিবর্ত্তিত হয় না।"

* যাজ্ঞবল্ক্য—৩৪১ শ্লোক।

"অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোষং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ।
সোঽচিরাদ্বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ॥" *

"অন্যায়পূর্ব্বক যে রাজা রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের কোষ পরিপূর্ণ করেন, তিনি অচিরে বিগতশ্রী হইয়া সবান্ধবে নাশ প্রাপ্ত হন।" মনু বলিয়াছেন,—

"মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥"৭।১১১
"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"৭।১১২।

অর্থাৎ যদি রাজা মোহবশে অন্যায়রূপে নিজরাজ্য শোষণ করেন, তাহা হইলে অচিরে রাজ্যভ্রষ্ট ও সবান্ধবে নিধন প্রাপ্ত হন। প্রাণিগণের শরীর কর্ষণ করিলে যেরূপ প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রকর্ষণেও রাজার প্রাণ ক্ষীণ হয়।

বামদেব ধর্ম্মনাশকারী রাজাকে বধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ ধর্ম্ম,

* যাজ্ঞবল্ক্য ৩৪০ শ্লোক। † "অসৎ পাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।"—মহাভারত, বামদেবগীতা।

রাজনীতি।

নীরবে অন্যায় সহ্য করা পরিপূর্ণ অধর্ম্ম। মনে মনে গুম্‌রিয়া মরার চেয়ে প্রতিরোধ করা মনোরাজ্যে মঙ্গল-প্রদ। শাস্ত্রে আততায়ীর বিনাশ ধর্ম্মরূপে উল্লিখিত। উহা বিপদ্ধর্ম্ম। বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে বশিষ্ঠের অভ্যুত্থান রাজার বিরুদ্ধে প্রজার অভ্যুত্থানের দ্যোতক। আততায়ী বালির বিরুদ্ধে সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতির উত্থান শাস্ত্রসম্মত। অন্যায় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে দেওয়া সঙ্গত ও শোভন নহে। বাস্তবিক, অত্যাচারীর শাসন করা বিধেয়। এজন্য গ্রোসিয়াসের এই মত অশোভন।

গ্রোসিয়াস্ সমাজগঠন সম্বন্ধে সহজভাব স্বীকার করিয়াছেন। মানবপ্রাণে সমাজ বদ্ধ হইবার স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে সমাজ গঠিত হইয়াছে—ইহাই তাঁহার অভিমত। ইহা শোভন। কিন্তু সমাজ-শাসন-প্রণালীতে চুক্তি ব্যতীত তিনি অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। মানুষ যেরূপ স্বাভাবিক প্রবণতায় সমাজবদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রকর যেমন চিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে নক্সা মনে মনে অঙ্কিত করে এবং শেষে তুলির সাহায্যে বিবিধ রং প্রতিফলিত করিয়া

চিত্র অঙ্কিত করে, স্থপতি যেমন প্রাসাদ-নির্ম্মাণের নক্সা মনে মনে অঙ্কিত করিয়া শেষে মাল মশলা দিয়া রম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, সমাজশাসনযন্ত্রও সেইরূপ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। প্রত্যেক জাতির স্বভাবের অনুরূপ জাতীয় শাসনযন্ত্র আবির্ভূত হয়। স্বভাবের প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সর্ব্বনাশের কারণ হয়। শাসনযন্ত্র স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। উহা "গড়ান" জিনিষ নহে। মানসগঠন স্বাভাবিক। রং বেরং তোলা শেষের কার্য্য। রং বেরং তোলাতে কতকটা কৃত্রিমতা আছে। চিত্র স্বভাবের অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রও সেইরূপ স্বভাবের বিকাশ। পশুগুলি দলবদ্ধ ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের প্রকৃতির অনুযায়ী শাসন পদ্ধতি হইয়াছে। জাতিই সত্য, ব্যক্তিই মিথ্যা। সমষ্টিই সৎ, ব্যষ্টিই মিথ্যা। ভূবিদ্যায় দেখিতে পাই সমষ্টিই পূর্ব্বে উদ্ভূত হইয়াছে। ভূস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতিভাত হয় জাতিই মূল; একটী বৃক্ষ হয় না, বনই উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটি মানব উদ্ভূত হয় নাই, মানব-জাতিই উদ্ভূত হইয়াছে। আদম ও ইভের মত স্ত্রী পুরুষদ্বয় হইতে বিশ্বমানব উদ্ভূত হয় নাই, মানব সমাজ হইতে মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জীবজগৎ

সমষ্টিরই সাক্ষ্য প্রদান করে। ভূবিদ্যার (Geology) এই সার সত্যটী অনুধাবন করিলে সমাজের স্বাভাবিকতাই প্রতিপন্ন হয়। সমাজ যেমন স্বভাবের স্ফূর্ত্তি, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রও সেইরূপ স্বভাবেরই স্ফূর্ত্তি। সমাজ হইতে ব্যক্তির বিকাশ হইয়াছে, তবে আমরা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বিচার করি বলিয়াই ব্যক্তির প্রাধান্য দেই। মনোরাজ্যেও গোত্ব মানবত্ব অগ্রে ফুটিয়া উঠে, ব্যষ্টিত্ব বিশেষত্ব পরে আত্মপ্রকাশ করে। জাতি (Genus, Species) হইতে ব্যক্তির (individual) বিকাশ। পক্ষীসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে উদ্ভূত হয়, তাহাদের শাসন-শৃঙ্খলা পক্ষীসুলভ স্বভাব অনুসারেই হয়; কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও তাহাই। জীবনের ধর্ম্ম সংহনন। সঙ্ঘাতেই সমাজ। সঙ্ঘাতই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া মনের উপাদান ও ঐতিহাসিক ধারা অনুসারে শাসনযন্ত্রও পৃথক হইয়াছে—ইহাই পৃথিবীর ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্রকৃতি আপনার পরিবেষ্টন খুঁজিয়া লয়। যদি শাসনযন্ত্র স্বভাবানুযায়ী না হইত, কেবল চুক্তিবলে শাসনযন্ত্র রচিত হইত, তাহা হইলে সকল দেশের সকল জাতির শাসনশৃঙ্খলা একরূপ হইত। কারণ, চুক্তি

সম্বন্ধে মানবের ধারণা অনেকাংশে একরকম। শাসন-যন্ত্রের বিভিন্নতা মানবীয় প্রাকৃতিক উপাদানের বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিকতাই উহার প্রাণ।

আদিম অঙ্গীকার বলে মানুষ অঙ্গীকার পালনে বাধ্য হয়, ইহাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, মানব সহজ ভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, মানবের আদিম অবস্থা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে উহাতে স্বাভাবিকতার প্রবলতা সমধিক। মানব তখন স্বভাবের শিশু। সমাজে—পরিবারে, পিতা পুত্রকে, মাতা সন্তানকে পালন করিয়াছে। পুত্র পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে, সংসারের কর্ত্তা কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়াছে, আর সকলে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও চুক্তি বা আদিম অঙ্গীকার দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং উহা স্বাভাবিক প্রবণতা (Native impulse)।

গ্রোসিয়াসের মতে মানব সমাজবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার বা চুক্তির অনুবলে রাজা বা কোনও প্রতিষ্ঠানের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছে। তাঁহার মতে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ আদিম নহে। একটা চুক্তি করিয়া প্রজারা রাজার হস্তে শাসনভার প্রদান করিয়াছে। অবশ্যই

গ্রোসিয়াস্ বিপ্লবের বিরোধী। রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহা বিদ্রোহ। কিন্তু যদি কোনওরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য প্রজা রাজার বিরুদ্ধে কেন অভ্যুত্থান করিতে পারিবেনা? রাজা চুক্তি ভঙ্গ করিলেও রাজাকে শাসন করিবার অধিকার প্রজার থাকিবে না কেন? চুক্তি রক্ষা বা অঙ্গীকার পালন করিতে উভয় পক্ষই বাধ্য। এক ব্যক্তির পক্ষেই চুক্তি পালনীয়, অন্যের পক্ষে নহে ইহা কখনই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সঙ্গত হইতে পারে না। আদিম চুক্তিতে কি শাসকের সত্তা নাই? আদিম চুক্তিতে কি মানুষ কোনও রক্ষক স্বীকার করে নাই? তবে চুক্তি হইল কাহার সঙ্গে? যদি বলি, পরস্পর পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেও আন্তর্জ্জাতিক মীমাংসার কোনও সূত্র নাই, বিভিন্ন সমাজের একীকরণের সুযোগ নাই, সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ সকলকে এক সংহতিতে পরিণত করিবার উপায় নাই। সমাজের বাদবিসম্বাদ মিটাইবার ব্যবস্থা নাই, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত অন্য ব্যক্তির বিবাদের নিষ্পত্তির স্থল নাই, এমতাবস্থায় সমাজ চলিতে পারে কি? সমাজের নরনারীর সমান অধিকার না থাকায় চুক্তির সমবিষমতা

অবশ্যম্ভাবী। শিশু সমাজের অঙ্গ। মূর্খও সমাজের এক জন। বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্কও সমাজের অঙ্গীভূত। এমতাবস্থায় পরস্পরের সহিত চুক্তি কি প্রকারে সম্ভব? দৈহিক ও মানসিক বলের ন্যূনাধিক্য সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। এই অবস্থায় চুক্তির সমতা কি রকমে সম্ভব? প্রবল দুর্ব্বলকে শাসন করে ইহাই ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের চুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল রক্ষা করে না। আমাদের মনে হয়, প্রজাশক্তিও যেরূপ স্বাভাবিক রক্ষণ-শক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক, এ অংশে গ্রোসিয়াসের মত শোভন ও সমীচীন নহে।

গ্রোসিয়াসের মতে নিয়ম প্রতিপালন করিবার জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্য অথবা মৌন অঙ্গীকার করিয়াছে। অঙ্গীকারের কথা উঠিলেই জিজ্ঞাস্য—কে কাহার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা একরূপ হইবে কেন? মানবের মানসিক ভিন্নতায় প্রতিজ্ঞার ভিন্নতা অপরিহার্য্য। নিয়মের নিকট মাথা পাতিয়া দেওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ নহে। মানুষের জন্য নিয়ম। নিয়মের জন্য মানুষ নহে। মানুষ জীবনের প্রসারের জন্য নিয়ম প্রতিপালন করে। মানব-

রাজনীতি।

জীবন কেবল নিয়মে আবদ্ধ নহে। নিয়মের উপরেও সে আপন কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত। যখন মানুষ বুঝিতে পারে—নিয়ম তাহার প্রাকৃতিক প্রসারের অনুকূল, তখনই মানুষ নিয়ম মানিয়া লয়। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বহির্জ্জগতে যেরূপ অপ্রতিহত, মনোজগতে সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। মানুষ বহির্জ্জগতের প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে চাহে এবং আপনার অন্তরস্থ প্রকৃতিকেও জয় করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়।

গ্রোসিয়াসের মতে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নিয়ম মানিয়া চলিতে মানুষ স্বীকৃত হয়। এই প্রতিজ্ঞা কে কাহার সহিত করিল? নিয়মের প্রণেতা কে? নিয়মের প্রবর্ত্তন কেন আবশ্যক? নিয়ম মানিবার প্রয়োজন বোধ কোথা হইতে আসিল? সুতরাং বলিতে হয়, নিয়মের প্রবর্ত্তন প্রকৃতিসিদ্ধ। সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশের একটা ধারা আছে, প্রকৃতির অনুকূলতায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকৃতির অনু-বলেই মানুষ নিয়ম মানিতে শিক্ষা করে। দয়া, পরোপকার, সহানুভূতি প্রভৃতি প্রবৃত্তি যেরূপ মানবের স্বাভাবিক, শৃঙ্খলারক্ষার চেষ্টাও সেইরূপ স্বাভাবিক। কল্যাণের জন্যই মানব নিয়মকে বরণ করে। মানব

শৃঙ্খলা চায়,শৃঙ্খল পছন্দ করে না। প্রবৃত্তির অনুরাগেই নিয়মের উদ্ভব হয়। নিয়ম প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা বোধও মানবের স্বভাব। বাঁচিবার জন্য চেষ্টা আকীট মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মানুষ উন্নত হইতে চাহে। ইহা মানবীয় স্বভাব। এই সহজাত ভাবের প্রেরণায় নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার উপর রং ফলান অনেক পরিমাণে কৃত্রিম হইতে পারে; কিন্তু সেই রং ফলানও স্বাভাবিক অনুকূলতার সাহায্যে সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কর্ত্তব্যবোধ আইন করিয়া জন্মান যায় না। কর্ত্তব্যবোধ মানবস্বভাবের স্ফূর্ত্তির সহিতই জন্মে। এই স্বাভাবিকতার উপরেই নিয়মের প্রবর্ত্তন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজশক্তির আবির্ভাব; সমাজসঙ্ঘাত থাকিলেই রক্ষণশক্তি থাকিবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই আদানপ্রদান চলিয়াছে। অতএব দার্শনিক গ্রোসিয়াসের মত এই অংশে অসমীচীন ও অসঙ্গত।

এল্‌থাস্‌ এবং গ্রোসিয়াস্‌ ইউরোপের প্রজাতন্ত্র মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ইহারা চুক্তি ভিন্ন স্বাভাবিকতা দেখিতে পান নাই। চুক্তি থাকিলে মানবের স্বাধীনতা কোথায়? সহজাত ভাবের (Natural Light) সম্ভাবনা কোথায়? চুক্তিবদ্ধ হইলেই বাঁধাবাঁধি অনি-

বার্য্য। উহা একপ্রকার দাসত্ব। মানবের স্বাধীনতা যদি স্বভাবজাত হয় এবং শাসন যদি চুক্তিবলে সাধিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী; অতএব এই মতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে টমাস্ হব্‌সের মতও আলোচনার যোগ্য। তিনিও চুক্তিবাদী।

হব্‌সের মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—"মানবের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি পরস্পর সমতা রক্ষা করে না; ইহা আমরা সাধারণতঃ যুদ্ধাদিতে প্রকট দেখিতে পাই। যুদ্ধবিগ্রহের উদ্ভব অনিবার্য্য। একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে এইরূপ ভয় সর্ব্বদাই থাকে। রাজকীয় শাসন না থাকিলে মনুষ্যের যে অবস্থা হয় সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় সকলেই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি এবং উদ্দাম শক্তিই শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারিত করে। এই অবস্থায় ভয়, ঘৃণা এবং চঞ্চল চিত্তবৃত্তিগুলিই সবিশেষ প্রবল: কিন্তু চিত্তের শান্ত অবস্থায় মানুষ দেখিতে পায়, পরস্পরের সাহচর্য্য ও সম্মিলনে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অধিকতর ফল লাভ হয়। ইহার উপরেরই নৈতিক নিয়মের উদ্ভব—শান্তির

জন্য চেষ্টা কর, শান্তি অসম্ভব হইলে, যুদ্ধই করিতে হইবে। এই নিয়মের ফলে কতকগুলি সুপ্রবৃত্তির বিকাশ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার উদয় হয়।

বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, সহৃদয়তা, সহনশীলতা, ন্যায়-পরায়ণতা এবং সংযম প্রভৃতি সমাজরক্ষা ও শান্তিরক্ষার জন্য আবশ্যক। অতএব ইহাই সাধারণ নিয়ম—অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে অনিচ্ছুক, সেইরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি করিবে না। কিন্তু হব্‌সের মতে অন্যের প্রতি ন্যায়বান্ হওয়া এবং অন্যকে সাহায্য করা সবলতা ও মহত্ত্বের চিহ্ন।

এই সকল আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তন এবং প্রয়োগ করিতে সুদৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি-সুলভ স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা মৌন বা প্রকাশ্য চুক্তিবলে সম্পাদিত হইতে পারে। চুক্তির বলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অসীমাবদ্ধ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ত্যাগ করে এবং সরকারের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এল্‌থাস্ এবং গ্রোসিয়াস্ সমাজের মূলীভূত চুক্তি হইতে রাষ্ট্রীয় মৌলিক চুক্তি পৃথক্ করিয়াছেন। কিন্তু হব্‌স্ উভয়ের সম্মিলন সাধন করিয়াছেন।

রাজনীতি।

পরস্পরের যুদ্ধ তিরোহিত করিতে হইলে রাজশক্তি যথেচ্ছরূপে স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। শাসনযন্ত্রশূন্য কোনও জাতি থাকিতে পারে—ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। রাষ্ট্রীয় শাসন তাই মনুষ্যের মৌলিক পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের ফল। হব্‌স্‌ যথেচ্ছাচার শাসনের পক্ষপাতী। কোনও সম্প্রদায়, বা সদস্যবর্গ, বা 'চার্চ্চ' রাজশক্তির সঙ্কোচ বিধান করিলে ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এবং সমাজ প্রকৃতিসুলভ অবস্থায় পরিণত হইবে (consequent retrogression to the state of nature)। রাজার ইচ্ছাই প্রজার ইচ্ছা। মৌলিক চুক্তিবলে রাজাতে ব্যক্তিবিশেষের সকল অধিকার পর্য্যবসিত।

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সকল মীমাংসা রাজাই করিবেন। ভগবানকে কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে তাহাও রাজা নির্দ্ধারণ করিবেন। কারণ, ইহা না করিলে একের উপাসনা অন্যের নিকট অবমাননা বলিয়া বোধ হইতে পারে। ফলে বিগ্রহের উদ্ভব হইবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এই কারণেই ভালমন্দের শেষ নিষ্পত্তি রাজার উপরেই নির্ভর করিবে! রাজার স্বেচ্ছাচারের উপরেই

রাজনীতি ও কর্ম্মনীতির মৌলিক মত স্থাপিত হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে হব্‌স্ অষ্টাদশ শতাব্দীর যথেচ্ছাচার মূলক শাসনের হোতা। কোনও সম্প্রদায়বিশেষ বা কোনও দলের প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এমন একটী রাষ্ট্রীয় শক্তি গঠিত হইবে, যাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে এবং শিক্ষার ক্রমিক উন্নতিও বিহিত হইবে।"

হব্‌সের মতের সমালোচনা—জগতের মূলে বৈষম্য আছে। মনের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন। বিবাদ বিসম্বাদ অনিবার্য্য। যুদ্ধও অপরিহার্য্য। তাহা মীমাংসার জন্য শাসনযন্ত্রের আবশ্যকতা। এই মতের আমরা অনুমোদন করি। ভারতীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—"রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ"। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু হব্‌সের মতে মানুষ রাজাকে তৈয়ারী করিয়াছে। প্রতিশ্রুতি বা মৌন চুক্তির বলে

শাসনযন্ত্র গঠিত হইয়াছে, ইহার অসারতা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

"শান্তি অসম্ভব হইলে যুদ্ধই করিতে হইবে", এই সিদ্ধান্ত শোভন। আমরা বলি শান্তির জন্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) এবং বিশ্ব-মানব-প্রেমবাদী (Humanist) হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু কথাটি সার্থক। জগতে বৈষম্য আছে, যুদ্ধও থাকিবে। প্রেমে অনেকের উপকার ও পরিবর্ত্তন হয় না, দণ্ড আবশ্যক। স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত আছে। যুদ্ধ অনিবার্য্য। বুদ্ধদেবের অনুশাসন—"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং। অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো" (ধম্মপদ, যমকবগ্গো: ৫) সন্ন্যাসীর জন্য। ইহা সাধারণের জন্য নহে। প্রতিকারের পিপাসা আছে, এমতাবস্থায় প্রেমের ধর্ম্ম অসম্ভব। সংশোধন করিতে শাসনেরও আবশ্যকতা আছে। অপরিহার্য্য হইলে যুদ্ধ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। বৌদ্ধ-গণ রাষ্ট্রীয় শাসনে রক্তের স্রোতে দেশ ভাসাইয়াছে, ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। মনু বলিয়াছেন,—

"ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
তথাযুধ্যেত সম্পন্নো বিজয়েত রিপূন্ যথা ॥" ৭।২০০

অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ, এই তিন উপায়ে শান্তি অসম্ভব হইলে, যুদ্ধ করিবে। যেনতেন প্রকারেই শত্রুকে পরাজিত করিবে।

শান্তি স্থাপনের পথ যুদ্ধ। যুদ্ধ যজ্ঞ। ভগবান্ যুদ্ধযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধের সারথি এবং মন্ত্রণাদাতা। তিনি পাণ্ডব পক্ষের প্রাণস্বরূপ এবং যুদ্ধের উদ্যোক্তা।

সহনশীলতার একটা সীমা আছে। পূর্ণরূপে সহনশীলতা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে মানুষ অপদার্থ হয়। জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যুদ্ধ ঔষধের ন্যায় প্রয়োজনীয়। এই জন্যই জর্ম্মন্ দার্শনিক নিট্‌শে বলিয়াছেন—"For nations that are growing weak and contemptible, war may be prescribed as a remedy" অর্থাৎ যে সকল জাতি দুর্ব্বল ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছে, যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে ঔষধ।

রাজনীতি।

হব্‌সের নৈতিক মতটি হইতে ভারতীয় আদর্শ আরও উচ্চ। হব্‌সের মতে "মানুষ অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে অনিচ্ছুক, এরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি করিবে না।" লোকের প্রতি মনের ভাব সম্বন্ধে ভারতীয় উপদেশ এই—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ অন্য, বন্ধুবর্গ, মিত্র ও শত্রুর প্রতি সর্ব্বদাই আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। ইহাই দয়া বলিয়া সাধুগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধেও ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবং", ইহাই সেব্য। ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ আদর্শ জ্ঞানকাণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডে আত্মপর বোধ বিদূরিত হইয়াছে। অবশ্যই জ্ঞানী জ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মবস্তুকেই সন্দর্শন করেন। জ্ঞান দৃষ্টিতে ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ—

"সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি" ॥(মনু) *

সুদৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু প্রাকৃতিক স্বাধীনতা কেন ত্যাগ করিতে হইবে—ইহা বুঝা সুকঠিন। অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার্য্য। উহা স্বাধীনতা নহে। প্রাকৃতিক আদান প্রদানে কেহ কাহারও অধীন নহে। পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্য করিতেছে মাত্র।

ভারতে ধর্ম্মানুশাসন মানিয়া চলা অধীনতা নহে। কারণ, উহাতে প্রকৃত স্বাধীনতার বিকাশ হয়। ধর্ম্মই মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতির স্বাভাবিক উপায়। ধর্ম্মের অনুবলে রাজা প্রজা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এস্থলে প্রজার স্বাধীনতা রাজার পদতলে উৎসর্গীকৃত হয় না। উভয়ের স্বাধীনতা বিকাশই উভয়ের ধর্ম্ম। ভারতীয় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য—সমকালে ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা। এই ধর্ম্মের উপরেই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি। পিতা পুত্রের আচার্য্য। পিতা পুত্রের মুক্তির পথ

* অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্বভূত নিজেতে দর্শন করিয়া আত্ম-যজ্ঞকারী স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

সহজ সরল করিয়া দেয়। পুত্রও পিতার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। রাজা প্রজা সম্বন্ধেও তাহাই।

হব্‌স্‌ নিরঙ্কুশ শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী। প্রজা মৌলিক চুক্তিবলে একবার শাসন মানিয়াছে, আর ফেলিবার উপায় নাই। রাজার মতেই প্রজার মত। ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবে রাজা। ভালমন্দ নির্দ্দেশ করিবে রাজশক্তি। ভগবৎ উপাসনার ধারা নির্দ্দেশ করিবে রাজশক্তি—এই মত অতীব অসার ও অসমীচীন। নিরঙ্কুশ শাসনতন্ত্রে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়; মানুষ যন্ত্র হয়; মানুষ জড়বস্তু হইয়া পড়ে; ব্যক্তিত্বের প্রসার রুদ্ধ হয়; সমাজের বিকাশ হইতে পারে না। নিরঙ্কুশ শাসনে রাজার অত্যাচার নিবারণের পন্থা নাই। অত্যাচারে, অবিচারে মানুষ অপদার্থ হইবেই। প্রাকৃতিক নিয়মে ভালবাসার ও ধর্ম্মের উপরে পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতির উপরে রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল হইলে সে শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লোকমত যথেচ্ছাচারের সর্ব্বদাই বিরোধী। অতএব চুক্তিবদ্ধ হইয়া মানুষ কখনই অত্যাচার—যথেচ্ছাচার বরণ করিতে পারে না। ইহা মনোরাজ্যে অসম্ভব

(Psychologically impossible)। ইহা স্বাভাবিকও নহে। জ্ঞানী ব্যক্তি জনসাধারণের মস্তিষ্ক। জ্ঞানী যথেচ্ছাচার আদপেই পছন্দ করিতে পারেন না। স্বভাব-সিদ্ধভাবেই জ্ঞানী যথেচ্ছাচারের বিরোধী। পিতৃশাসন, মাতৃশাসন, গুরুর শাসনের মূলে স্নেহ আছে। উহাতে প্রেম আছে, স্বাধীনতা প্রদানের সূত্র আছে, উন্নতি বিধানের চেষ্টা আছে। উহা অত্যাচার অথবা যথেচ্ছাচার হইতে পারে না।

প্রেম ও কর্ত্তব্য উভয়ে মিলিয়া শাসনের তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রোথিত না হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাই, নহুষ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যাচারের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মুনিগণকে রথাশ্বরূপে সংযোজিত করিয়াছিলেন। তাহার পতনও অনিবার্য্য হইল। ইহাই ভারতীয় ধারা। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের আখ্যান রাজা ও প্রজাশক্তির বিরোধের নিদর্শন। বিশ্বামিত্র রাজশক্তি। তিনি অন্যায়রূপে বলপূর্ব্বক প্রজার সম্পত্তি গ্রহণে ব্যগ্র। বশিষ্ঠ প্রজাশক্তি। বশিষ্ঠের শক্তিতে বিশ্বামিত্র পরাহত। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি অবনত।

পরাজিত বিশ্বামিত্র বুঝিয়াছিলেন, প্রজাশক্তিই প্রকৃত শক্তি। তিনি তাই বলিয়াছিলেন—"ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।" পরশুরাম ভগবানের অবতার। ক্ষত্রিয়গণ মদমত্ত, অত্যাচারী। তাহাদের বিনাশের জন্য পরশুরাম অবতীর্ণ। পরশুরাম ব্রাহ্মণ, প্রজার প্রতিনিধি ; প্রজার উপর অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে বদ্ধপরিকর। একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রাজ-দর্প খর্ব্ব করিলেন। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি পরাহত হইল। ইহাই ভারতীয় শাস্ত্রের আদর্শ, ইহাই শিক্ষা। মদমত্ত রাজশক্তির নির্য্যাতনের জন্য ভগবচ্ছক্তির প্রয়োজন। ভগবানই প্রজাশক্তিরূপে স্বাভাবিক নিয়মে রাজশক্তিকে দমিত রাখেন। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিলে রাজাপ্রজায় বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। মৃচ্ছকটিক নাটকে শর্ব্বলিক অত্যাচারী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিল—ইহা বর্ণিত আছে। রাজনীতিবিৎ, বিচক্ষণ চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। সকলক্ষেত্রেই প্রজাশক্তি রাজশক্তিকে— নিয়ন্ত্রিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক এইরূপ না হইলে যথেচ্ছাচার শাসনে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

রাজা ধর্ম্মের বহিরঙ্গের প্রতিপালক ও রক্ষক। ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য রাজা ধর্ম্মতঃ দায়ী। কিন্তু ধর্ম্মের বিধান দিবার অধিকার রাজার নাই। রাজা ধর্ম্মের কর্ত্তা হইলে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি না হইলে জাতীয় জীবন অবশ্যই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইবে।

মানুষের অধিকারভেদেও ধর্ম্ম ভিন্ন। মানবের জন্য প্রকৃতির অনুকূল ধর্ম্ম বিহিত না হইলে, মানব-জীবনের বিকাশ অসম্ভব। প্রতিকূলতায় মানুষ মরিয়া যায়। বলপূর্ব্বক বা নিয়মপূর্ব্বক রাজা সকলকে এক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে—ইহা অস্বাভাবিক। ইহাতে মানবজীবনের উন্নতি অসম্ভব; বিনাশের পথেই মানব অগ্রসর হইবে। উপাসনার ধারাও প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন। মানসিক উপাদান এবং গঠনের জন্যই উপা-সনার ধারা বিভিন্ন হয়। সকলের উপাস্য এক রকমের বস্তু হইতে পারে না। যাহার যে অধিকার, সেই অধিকার অতিক্রম করিলে তাহার জীবনের প্রসার হয় না। যে, যে অবস্থায়, যে ভাবে অনুপ্রাণিত তাহাকে সেই অবস্থা ও ভাবের ভিতর দিয়া বিচার করিতে হইবে। ইহাই সনাতন পন্থা। ইহার অন্যথায়

মানুষ পাথর হইয়া যায়। ভালমন্দের বিচারও ব্যক্তিগত। অধিকারী ভেদে ইহারও বিভিন্নতা হয়। কোনও অবস্থায় যাহা ভাল অন্য অবস্থায় তাহাই মন্দ হইতে পারে। এক অবস্থায় যাহা মন্দ অন্য অবস্থায় তাহা ভাল হইতে পারে। হত্যা করা মন্দ। কিন্তু যুদ্ধে হত্যা মন্দ নহে। একের পক্ষে যাহা ভাল, অন্যের পক্ষে তাহা ভাল নহে। রোগীর পক্ষে বিষ ভাল। সুস্থের পক্ষে বিষ কখনই ভাল নহে। সরলতা ভাল, কিন্তু সহস্র লোকের প্রাণ যাইতেছে এরূপ ক্ষেত্রে সরলতা কখনই শোভন হইতে পারে না। ব্যক্তিরও সকল অবস্থায় ভালমন্দের বোধ সমান থাকিতে পারে না। চিত্তের চঞ্চলতায় বোধের বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। রাজা যদি ভালমন্দের নিষ্পত্তির শৃঙ্খলে সাধারণকে বন্ধন করেন, তাহা হইলে মানুষের বিচার শক্তির লোপ অনিবার্য্য। মানুষের মনুষ্যত্ব সে স্থলে বিনষ্ট অবশ্যই হইবে। রাজনীতি ও কর্ম্মনীতিতেও রাজার নিরঙ্কুশ অধিকার থাকিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার নিবারণের শক্তি সদস্য প্রভৃতির থাকা দরকার। যাঁহারা অতীন্দ্রিয়দর্শী, যাঁহারা জনসমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বাত্ম-

প্রেমিক, জীবের মঙ্গলই যাহাদের আদর্শ, যাঁহাদের মূলমন্ত্র—

"সর্ব্বেহত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥" *

ভারতের সেই ঋষিগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনায় রাষ্ট্রীয় মূলতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব এবং ব্যবহারতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেন। রাজা সেই ব্যবহারতত্ত্বের রক্ষক মাত্র। ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার রাজার আছে। যাহাতে ধর্ম্মের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় তজ্জন্য নৃপতির চেষ্টিত থাকিতে হইবে। কিন্তু বিধান দিবার অধিকার তাহার নাই। এই সকল অংশে হব্‌সের মত অশোভন।

দার্শনিক স্পিনোজার মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দার্শনিক স্পিনোজার মত কতক অংশে হব্‌সের অনুরূপ। কিন্তু তিনি নিরঙ্কুশ শাসনতন্ত্রের বিরোধী। তাহার রাষ্ট্রীয় মত তৎপ্রণীত 'Tractus Theologico Politicus' নামক প্রবন্ধে এবং অসমাপ্ত

* অর্থাৎ সকলে সুখী হউক, সকলে নিরাময় হউক, সকলে মঙ্গল স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হয়।

রাজনীতি।

'Tractus Politicus' নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। হবসের ন্যায় স্পিনোজাও প্রকৃতিসুলভ অবস্থা হইতে (From the state of nature) রাজকীয় শাসনের পার্থক্য সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে প্রকৃতিসুলভ অবস্থা হইতেও রাজশাসনে অধিকতর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা প্রদান কর্ত্তব্য। কোনও রাজ্যের প্রজা হইলেই ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে না। মানুষকে যন্ত্ররূপে বা পশুরূপে পরিণত করিবার অধিকার রাষ্ট্রের নাই। কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতি বিধান করাই রাজকীয় কর্ত্তব্য। রাজা যদি চিন্তা, বাক্য ও ধর্ম্ম সাধনের স্বাধীনতা প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্যের বৈপরীত্য আচরণ করা হইল।"

স্পিনোজার মতের সমালোচনা—এই মতের সার্থকতা অনেকাংশে আছে। ধর্ম্মের স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছাচার নহে। ইউরোপ ধর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সময় যথেচ্ছাচার পছন্দ করে। কিন্তু ভারতে ধর্ম্মের স্বাধীনতা অর্থে অধিকারী বিশেষে ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। যে যাহার অধিকারে নিজস্ব ধর্ম্ম পালন করুক, উচ্ছৃঙ্খল না হয়—ইহাই ভারতীয় শাস্ত্রের অনুমোদিত।

ধর্ম্মবিধি পালন না করিলে রাজা লোককে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। কারণ, এরূপ প্রবর্ত্তন না করিলে অনাচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সমাজ কলুষিত হয়। পাগলের পাগলামি, গোঁড়ার গোঁড়ামি কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। ভারতীয় ধর্ম্ম এরূপ স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত যে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেবল আচার প্রতিপালন জন্য রাজার খরদৃষ্টি দিতে হইত।

বিচারের স্বাধীনতা ছিল। আচারের বাঁধাবাঁধি ছিল, এরূপ বাঁধাবাঁধি না থাকিলে চলিতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য হয়। আন্তরিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্যই এই বাঁধাবাঁধি। চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভারতীয় বিধি অতীব শোভন। চিন্তার স্বাধীনতা ভারতের সনাতন উপাদান। মানুষ 'মতের দাস' না হয় তৎপ্রতি ভারতে সবিশেষ দৃষ্টি প্রদত্ত হইত। মানুষ চিন্তার স্বাধীনতায় ও প্রসারে দেবত্ব প্রাপ্ত হউক—ইহাই ভারতীয় শাস্ত্রের প্রধানতম অনুশাসন। যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন—

"বরং কর্দ্দমভেকত্বং মলকীটকতাং বরং।
বরমন্ধগুহাহিত্বং ন নরস্যাবিচারিতা॥"

রাজনীতি।

অর্থাৎ মৃত্তিকাতে ভেক হওয়া ভাল, মলের কীট হওয়া ভাল, অন্ধকার গুহায় সর্প হওয়া ভাল, কিন্তু মানুষের বিচারশূন্যতা কখনই স্পৃহনীয় নহে। ইহা অপেক্ষা চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সারাৎসার কথা আর কি হইতে পারে ? ভারতে চার্ব্বাকও হিন্দু, বুদ্ধদেবও অবতার। ভারতে বাক্যের স্বাধীনতা, চিন্তা বা মতের স্বাধীনতা তুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে। রাজকার্য্য সমালোচনা করিবার অধিকার প্রজার আছে। সত্য বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধেও মনু বলিয়াছেন—

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" অর্থাৎ সত্য বলিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে, অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, তাহাই প্রিয়-বাক্য। যেরূপ বাক্যে জীবের অকল্যাণ হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আপাতঃ সত্য হইলেও সত্য নহে। কারণ, সত্য অর্থ ভূতহিত। "সত্যং যথার্থভাষণং ভূত-হিতঞ্চ।" যে বাক্য দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত না হয়, বরং অকল্যাণ হয় তাহা পরিহার্য্য। অধিকন্তু মনের সহিত বাক্যের মিল না থাকিলে, সে বাক্য সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। "অশ্বত্থামা হত ইতি নাগঃ" এরূপ বাক্যের ন্যায় উহা মিথ্যা। বাক্য

ও মন এক হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।" * সর্ব্ব প্রকারেই বাক্যের স্বাধীনতা ভারতীয় বিধানে দেখিতে পাই। স্পিনোজার মতের সহিত আমাদের অনেকাংশে ঐক্য আছে। তাঁহার মতের উদারতা প্রশংসনীয়। অবশ্যই ধর্ম্মের স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছাচার আমরা অনুমোদন করি না। পূর্ণ স্বাধীনতার আমরাও পক্ষপাতী।

দার্শনিক লকের মত—"ইংরেজ দার্শনিক লক্‌ও চুক্তিবাদী। তবে তাঁহার মতের বিশেষত্ব আছে। লক্ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শাসনযন্ত্র (Government) সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তিনি আইনের দর্শনে রাজনৈতিক শাসন ও পিতৃ শাসনের পার্থক্য বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে রাজার অধিকার। বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষাও রাজার অধিকার। এরূপ অধিকার স্থাপন কেবল সহজ চুক্তি বলেই সাধিত হইয়াছে। এই চুক্তি মৌন অঙ্গীকারের ফল হইতে পারে। স্বাধীনতা প্রদানই

* অর্থাৎ বাক্য আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হউক। মন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। মনে ও বাক্যে আমার মিল থাকুক।

রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রকৃতি সুলভ অবস্থায় (In the state of nature) অনেক সময়েই স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা। যদি শাসনযন্ত্র নিজের দায়িত্ব রক্ষা না করে, জনসাধারণের এই যন্ত্র পরিবর্ত্তন বা বিধ্বস্ত করিবার অধিকার আছে।”

লকের মতের সমালোচনা—দার্শনিক লক্‌ও চুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি মৌন অঙ্গীকারের দিকেই সবিশেষ জোর দিয়াছেন। তবে এই অঙ্গীকার সহজ (uncons-trained), কোনওরূপ বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই। কথাটা একটু রহস্যপূর্ণ। অজানিত ভাবে কোনও চুক্তি বা অঙ্গীকার সম্ভবপর কি? বিনা জোরে যদি প্রতিশ্রুতি হইয়া থাকে এবং পরস্পর শাস্যশাসক প্রতিশ্রুতির বশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভা-বিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিশ্রুতির মূলে বল প্রয়োগ না থাকিতে পারে, কিন্তু চুক্তিবাদ পরিস্ফুট। এ অংশে লকের মত সমর্থন করিতে পারা যায় না।

রাজা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকারী। এ সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত ঐক্যমত হইতে পারিলাম না। আইন প্রণয়ন প্রজার হস্তে ন্যস্ত থাকাই সমীচীন।

ভারতের আইন প্রণয়ন প্রজার হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রজার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণই ব্যবহারতত্ত্বের ঋষি। প্রয়োগের অধিকার রাজার। এই ব্যবস্থাই সঙ্গত মনে হয়। জনসাধারণের আত্মনিবেদনেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত।

শাসনযন্ত্র নিজের দায়িত্ব রক্ষা না করিলে তাহার পরিবর্ত্তনে প্রজার অধিকার আছে। এই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। তিনি চুক্তিবাদী, ভারত স্বভাববাদী। ভারতে ধর্ম্মের অনুশাসনেই রাজা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণের জন্যই রাজশাসন আবশ্যক। অরাজকে জাতীয় বিকাশ অসম্ভব। ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিকাশের ধারা এক, কোনও পৃথক্ নাই। ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়াই সমষ্টির বিকাশ। অবশ্যই বৈষম্যনিবন্ধন মনোরাজ্যে উন্নতির মাত্রা আছে। রাজা ধর্ম্মতঃ সার্ব্বজনীন উন্নতির কেন্দ্র। রাজা ধর্ম্মের অনুশাসন না মানিয়া অত্যাচারী হইলে, অধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, তাহারও শাস্তি বিধেয়। নিয়ম-প্রয়োগ-কর্ত্তা নিয়ম ভঙ্গ করিলে অবশ্যই দণ্ডার্হ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে তাহার দণ্ডবিধান ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ সুসিদ্ধ। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, কিন্তু

প্রভু নহে। তাহাকেও ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডীয় আইনে রাজাকে শাস্তি দিবার বিধান নাই। রাজা অনাচারী, অত্যাচারী হইলে, কোনও অপরাধে অপরাধী হইলেও, তাহাকে দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে না। আইনের এমন কোনও বিধান নাই যাহাতে রাজা দণ্ডিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় ইহা অসমীচীন। যে ধর্ম্মের প্রতিপালক সে অধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার সমুচিত শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহা না হইলে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল কোথায়? এবিষয়ে ইংলণ্ডের আইনের বিধানকর্ত্তা ব্লাকষ্টোন্ সাহেবের (Blackstone) মত নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের বিধান তুলনা করিলে আদর্শের উচ্চনীচ ভাব পরিস্ফুট হইবে। ব্লাকষ্টোন্ সাহেবের মত এই—

"No suit or action can be brought against the sovereign even in civil matters, because no court can have jurisdiction over him. For all jurisdiction implies superiority of power; authority to try would be vain and idle without an authority

to redress; and the sentence of a court would be contemptible unless that court had power to command the execution of it; but 'who', says Finch, 'shall command the king?' Hence it is likewise, that by the law the person of the sovereign is sacred, even though the measures persued in his reign be completely tyrannical and arbitrary; for no jurisdiction upon earth has power to try him in a criminal way; much less to condemn him to punishment. If any foreign jurisdiction had this power, as was formerly claimed by the Pope, the independence of the kingdom would be no more, and if such power were vested in any domestic tribunal, there would soon be an end of the constitution, by destroying the free agency of the constituent parts of the legislative power."

(Kerr on Blackstone. Vol. 1 pp. 224 4th. Ed.)

"অর্থাৎ দেওয়ানী ব্যাপারেও রাজার বিরুদ্ধে কোনও রূপ মোকদ্দমা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ, কোনও বিচার-আদালতের তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃত্বের অর্থ ক্ষমতার আতিশয্য। বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, দণ্ডহ্রাস বা দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা নাই—ইহার কোনও অর্থই নাই। আদালত যদি নিজের দণ্ডাদেশ পালনে বাধ্য করিতে না পারে, সেরূপ দণ্ডাদেশের কোনরূপ মূল্য নাই। সে ক্ষেত্রে বিচার-আদালত হেয় হইয়া পড়ে। ফিন্‌স্‌ বলেন—'রাজাকে কে হুকুম করিবে'? সুতরাং আইনের অনুবলে রাজশরীর পবিত্র। রাজার শাসন অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারমূলক হইলেও তাহার শরীরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কারণ, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে রাজাকে অপরাধী বলিয়া বিচার করিতে পারে। তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার নাই বলিলেও চলে। যদি পোপের ন্যায় কোনও বৈদেশিক শক্তির অধিকার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রাজ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং এই ক্ষমতা যদি কোনও দেশীয় আদালতের হস্তে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে আইন প্রণয়নশক্তির উপাদান অংশ

গুলির স্বাধীন বিকাশ রুদ্ধ হওয়ায় শাসন যন্ত্র ধ্বংসোন্মুখ হইবে।"

এক্ষেত্রে আইনের সঙ্কীর্ণতা সবিশেষ পরিস্ফুট। ধর্ম্ম ও ন্যায় রাজা হইতেও বড়। ধর্ম্ম ও ন্যায় পদদলিত করিয়াও রাজা দণ্ডার্হ হইবে না—ইহার সার্থকতা বুঝা কঠিন। ভারতে রাজা ধর্ম্মের অধীন। অধর্ম্মাচরণ করিলে রাজা দণ্ডার্হ। অন্যে অন্যায় করিলে রাজা দণ্ড দিতে পারিবে, আর নিজে সে অপরাধে অপরাধী হইলে দণ্ডার্হ হইবে না, ইহার সারবত্তা কোথায় ? এরূপ হইলে বলিতে হইবে—'প্রভুর বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে পরের বেলা।' অত্যাচার নিবারণ জন্যই রাজা উদ্ভূত। সেই অত্যাচার নিজে করিলে অবশ্যই তাহার শাস্তি বিহিত হওয়া সমীচীন। ভারতে রাজার শরীর প্রকৃত রাজা নহে। রাজদণ্ডই প্রকৃত রাজা। অপরাধে রাজারও বিচার হইতে পারে। বিচার ক্ষেত্রে পুত্রকেও রাজার দণ্ডবিধান করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় বিধান।

"প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি।"

এই বিধান বলেই রাজার চলিতে হইত। মনু বলিয়াছেন—

"পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥"৮।৩৩৫

অর্থাৎ পিতা, আচার্য্য, সুহৃৎ, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পুরোহিত রাজার অদণ্ড্য কেহই নাই।

রাজার নিজেরও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বিহিত রহিয়াছে। সাধারণ লোকের দণ্ড হইতে রাজার দণ্ড আরও বেশী হইবে, ইহাই ভারতীয় সনাতন প্রথা। মনু বলিতেছেন—

"কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥"

অর্থাৎ যেক্ষেত্রে সাধারণ লোকের কার্ষাপণ দণ্ড হয়, সেই ক্ষেত্রে রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়াই বিধেয়।

ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ আর কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি সকল অপরাধের দণ্ড প্রয়োগ করিবে, তাহার অপরাধের বিচার নাই—ইহার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মের কঠিন সূত্রের অধীন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই রাজার রাজত্ব। ভারতে রাজা ধর্ম্মের অধীন। ইংলণ্ডে ধর্ম্ম রাজার অধীন। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিলে রাজার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়—ইহা

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতের বিষময় ফল। রাজা কোনও ধর্ম্ম-যাজকের অধীন নহে, কিন্তু ধর্ম্মের অধীন। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিলে রাজার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? ধর্ম্ম আত্মবস্তু।

ধর্ম্মই প্রকৃত স্বাধীনতা। অত্যাচার, যথেচ্ছাচার স্বাধীনতার ধর্ম্ম নহে। উহা পরিপূর্ণ অধীনতা। উহা মূর্ত্তিমতী দুর্ব্বলতা। ধর্ম্মই রাজাকে শাসন করিবে। ধর্ম্মবিধিই রাজ-শাসনের জন্য পর্য্যাপ্ত। আদালত ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই রাজার শাসনের—শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ডীয় আদর্শ ভারতীয় আদর্শ হইতে হীন। বিশেষতঃ এই মতবাদের কোনও নৈতিক ভিত্তি নাই; ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠা নাই; যুক্তির বিমল ভিত্তিতেও প্রোথিত নহে। ভারতীয় ভাব কবিবর রবীন্দ্র নাথ তাঁহার "কথা" নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দণ্ডদানের বিমল ভাব অতীব স্ফুট। এইগুলি ন্যায়-পরায়ণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পুনার প্রথম পেশোয়া বংশের রাজা রঘুনাথ রাও। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। যখন তিনি মহিশুর-পতি হয়দর আলীর সহিত যুদ্ধ করিতে আশী হাজার সৈন্য সঙ্গে

লইয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত, তখন বিচারক ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী আসিয়া পথমাঝে গতিরোধ করিলেন। বিচারক রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, আপনার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না।" রাজা বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, যবন নিপাত করিতে চলিয়াছি।" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"মহা-রাজ, আপনি ন্যায়ের অমোঘ কঠিন সূত্রে বদ্ধ।" রাজা তদুত্তরে বলিলেন—

"নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে।
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে।
শুনিতে আসিনি পথমাঝখানে,
ন্যায়বিধানের ভাষ্য॥"

নির্ভীক, ধর্ম্মগতপ্রাণ, সরল, শান্ত, বিচারক, দীন-দরিদ্র বিপ্র রামশাস্ত্রী বিচারকের আসন ত্যাগ করিয়া রাজপ্রদত্ত সম্পদ্ তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া নিজের দীন কুটিরে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রীর বাক্য কবির ভাষায় উল্লেখের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"কহিলা শাস্ত্রী,—রঘুনাথ রাও,
যাও কর গিয়ে যুদ্ধ।

আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলা ঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ ॥"

রাজা অনাচারী। বিচারক সূক্ষ্মধর্ম্মার্থদর্শী। বিচারক সকল রাজসম্পদ্ তৃণজ্ঞান করিয়া চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এই দৃষ্টান্তে রাজা দণ্ডার্হ। রাজা ধর্ম্মের অধীন। অপরাধ করিলে রাজাকে শাস্তি প্রদান ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সুসিদ্ধ—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবিবর ন্যায্য বিচারের দৃষ্টান্ত আরও দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত রাজপুতনার রাজা রতন রাও। তাঁহার নিকট আসিয়া কোনও ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আমার গৃহে ধর্ম্মনাশের জন্য চোর প্রবেশ করিয়াছিল। চোর ধৃত হইয়াছে। কি শাস্তি বিহিত?" রাজা রতন রাও উত্তর দিলেন—"চোরের শিরশ্ছেদ কর।" ব্রাহ্মণ আদেশানুসারে শিরশ্ছেদ করিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ যুবরাজকে হত্যা করিয়াছে। ইহার কি শাস্তি বিহিত হইবে?"

রাজনীতি।

"মুক্তি দাও কহিলা শুধু রতন রাও রাজা।" রাজা অপত্যস্নেহে ধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই। ন্যায়ের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই।

কবিবরের অন্য দৃষ্টান্ত কাশী-রাজ-মহিষী করুণা দেবী। রাজ-মহিষী বরুণা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। মাঘ মাস; প্রবল শীত। শীত-কাতর মহিষী সহচরীদিগকে দরিদ্র প্রজাগণের কুটিরে অগ্নি প্রদান করিয়া শীত অপনোদনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সহচরী আপত্তি উত্থাপন করিল; তিনি আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। অগ্নিতে দরিদ্র প্রজার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভস্মীভূত হইল। স্নানান্তে রাণী রাজধানীতে ফিরিলেন। দরিদ্র প্রজাগণ ভয়ে সঙ্কোচে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সকল নিবেদন করিল। রাজা লজ্জায় নতশির হইলেন এবং সভা ভঙ্গের পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাণী বলিলেন—"ইহাতে এমনই বা কি ক্ষতি হইয়াছে? আমার এক প্রহরের আমোদে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হয়।" রাজা দাসীকে ডাকিয়া রাণীর আভরণ সকল উন্মোচন করাইলেন। ভিখারিণীর বেশে রাজধানীর বাহির করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন—

"যতদিনে ভিক্ষাদ্বারা এই দরিদ্র প্রজাগণের নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার না করিতে পার, ততদিন এগৃহে প্রবেশ করিও না।" ইহাই ভারতীয় আদর্শ।

মুসলমান শাসনকালেরও একটী ঘটনা শুনিতে পাই। তাহাও রাজার অপরাধের শাস্তির নিদর্শন। সম্রাট্ গিয়াসউদ্দিন একদিন অনবধানতা বশতঃ শিকার করিবার সময় জনৈক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তানকে গুলি করেন। বৃদ্ধা বিচারপ্রার্থিনী হইয়া কাজির নিকট উপস্থিত হয়। কাজি সম্রাটকে তলব করিলেন। সম্রাট্ আসামীর আসন গ্রহণ করিলেন। বিচারক বিচার পূর্ব্বক সম্রাটের অর্থদণ্ড করিলেন। সম্রাট্ অর্থ প্রদান করিয়া আসামীর আসন ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন—"আজ যদি তুমি প্রকৃত বিচার না করিতে, তাহা হইলে তরবারী দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ করিতাম।" তখন কাজি উত্তর দিলেন—"আজ যদি আপনি আমার বিচার না মানিতেন, তাহা হইলে আমি বেত্রদ্বারা আপনাকে আঘাত করিতাম।" ইহাই ভারতীয় ভাব। অত্যাচার, অনাচার করিলে রাজাও দণ্ডার্হ। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় আদর্শ হীন। এ বিষয়ে আমরা ব্লাকষ্টোন্ সাহেবের (Blackstone)

অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমাদের নিকট রামচন্দ্রের সীতা-বর্জ্জন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জনই আদর্শ। সীতা রামচন্দ্রের "কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী। স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গেষু সখী।" প্রাণসমা প্রিয়তমাকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠা নাই। ইহাই ভারতের আদর্শ।

ইউরোপীয় প্রজা-তন্ত্রবাদ ফরাসী বিপ্লবের ফলে আত্মপ্রকাশ করে। প্রজাতন্ত্রের মূলমন্ত্র তথা-কথিত সাম্যবাদ। ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র,—স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity)। এই তথাকথিত সাম্যবাদের উপরেই বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা। ভল্‌টেয়ার (Voltaire) প্রভৃতিই এই বিপ্লববাদের দার্শনিক। রুশো বিপ্লবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে এই বিপ্লবযজ্ঞের পুরোহিত বলা যাইতে পারে। তাঁহার মত আলোচনার যোগ্য। নিম্নে তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

রুশোর মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

"রুশো গণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী। এল্‌থাসের পরে এমন ভাবে আর কেহ ইহার সমর্থন করে নাই। তাঁহার মতে সার্ব্বজনীন ইচ্ছাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারআদালত।

ইহাতেই জনসাধারণের শাসন করিবার আন্তরিক প্রবণতা বা প্রবলেচ্ছা অভিব্যক্ত। ইহার উপরেই সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত, এবং ইহাই নিয়ত পরিবর্ত্তিত জন সমূহের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গল বিধানে নিয়োজিত। এইভাব দেশপ্রাণতায় আত্মপ্রকাশ করে। ইহা ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার অনুরূপ। ইহার অধীনতা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীনতার সঙ্কোচ নহে। কারণ, ইহাতে সকল ব্যক্তির ইচ্ছা সম্মিলিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই রাজ্যের সদস্য।

জনসাধারণের অনুশীলন ও চরিত্রের ভিন্নতা অনুসারে শাসনযন্ত্রেরও ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। রুশো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষপাতী। কারণ ক্ষুদ্র রাজ্যেই সাধারণের ইচ্ছার সহজ প্রকাশস্বরূপ আচার ও ব্যবহার সাধারণের কার্য্যের ধারা নির্দ্দেশ করিতে পারে। ইহাতে কোনওরূপ মধ্যস্থতা করিবার বা বাঁধা আইনের আবশ্যকতা নাই। ইহার ফলে মানবের সহানুভূতি ও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করিবার উপযোগী অবস্থা লাভ হয়। মানুষ যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় এবং শাসন-শৃঙ্খলা নিতান্ত কঠোর হওয়া অনাবশ্যক। অধিকন্তু বৃহৎ রাজ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্যেই প্রজাসাধারণ

রাজনীতি।

শাসনকার্য্যভার অধিক পরিমাণে নিজেদের হস্তে রাখিতে পারে। কোনও বৃহৎ জাতির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা ক্ষুদ্র রাজ্যের মিলন সংসাধন।

রুশোর মতের সমালোচনা—রুশোর মত আপাতঃ মনোজ্ঞ বটে, কিন্তু বিচারে কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। "সার্ব্বজনীন ইচ্ছার" (Universal Will) উপরেই তাঁহার মতবাদের প্রতিষ্ঠা। এই সার্ব্বজনীন ইচ্ছাটী কি? সকলে কখনও একমত হইতে পারে না।' রক্ষকের আবশ্যকতা বোধ স্বাভাবিক হইলেও এ সম্বন্ধে ইচ্ছার তারতম্য আছে। কাহারও ইচ্ছা প্রবল, কাহারও ইচ্ছা মধ্যম, আবার কাহারও বা অতিকম। এইরূপ মাত্রার তারতম্য অনিবার্য্য। যে কোন দেশেই হউক না কেন সকলে কখনও একমত হইতে পারে না। ইচ্ছার ধারার ভিন্নতাও আছে। মানসিক উপাদানের ভিন্নতা, শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্নতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতায় ইচ্ছার ভিন্নত্ব অনিবার্য্য। অতএব 'সার্ব্বজনীন ইচ্ছা' কল্পনামূলক। রুশোর মুখ্য মতবাদ স্বকপোল-কল্পিত। ইহার উপরেই তাঁহার সমস্ত দর্শনের ভিত্তি।

যাহার মূলেই দোষ, তাহার দোষ সর্ব্বত্র। তিনি স্বভাববাদী হইয়াও কতকটা পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন। 'সার্ব্বজনীন ইচ্ছা' তাই শেষ বিচার আদালত বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থল হইতে পারে না। কোনও বৃহৎ সাম্রাজ্যের এইরূপ 'সার্ব্বজনীন ইচ্ছা' সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের আশা আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতায় সকল ব্যাপারে সকলের ইচ্ছা একমুখীন হইতে পারে না। যে কোনও ব্যাপারেই মতদ্বৈধের সম্ভাবনা। স্বামীস্ত্রীর মতের অনৈক্য হয়। পিতাপুত্রের মতের ঐক্য থাকে না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যেক নর-নারীর শক্তি সামর্থ্যের তারতম্য আছে। অতএব অধিকারও সমান নহে। শিশু, যুবক, প্রৌঢ় সকলের অধিকার সমান হইতে পারে না। মানবীয় ধর্ম্মের বিভিন্নতায় ভিন্নতা অনিবার্য্য। একদল শান্তিপ্রিয়, অন্যদল বিগ্রহপ্রিয়। একদল শিক্ষার বিস্তার চায়, অন্যদল বিস্তার রুদ্ধ করিয়া গভীরতা চায়। এইরূপ ইচ্ছার বিরোধ দৈনন্দিন ঘটনা। উনিশ বিশের মাপকাঠি দিয়াও 'সার্ব্বজনীন ইচ্ছা' স্থাপিত হইতে পারে না। এই মৌলিক মত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বস্তু-

তন্ত্রহীন। ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া কোনও শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বৈষম্যের উপরে সাম্য স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সাম্যের নামে বৈষম্য আসিবেই। রুশো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—লোকের শিক্ষা ও চরিত্রের ভিন্নতায় শাসনযন্ত্র বিভিন্ন হয়। অতএব সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয় নাই, পূর্ব্বাপর সঙ্গতিও নাই। কারণ শিক্ষাদীক্ষার ভিন্নতায় ইচ্ছারও বিভিন্নতা অনিবার্য্য।

রুশোর মতে একজাতির ভিতরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিয়া সম্মিলিত করিলে শাসনযন্ত্র পরিচালনের সুবিধা হয়; ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বাধীনতার বিকাশ হইতে পারে, জাতিও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। এই মত আমাদের অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়। খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলি জাতীয় পতনের মূলীভূত কারণ। এক অখণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে জাতীয় ঐক্য ভাষা, ভাব, শিক্ষা ও শাসনের ভিতর দিয়া সুদৃঢ় হইতে পারে। শাসনের ঐক্যে জাতি এক হয়। রাজনৈতিকক্ষেত্রে ঐক্যের মতন বল নাই। ইহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি জিগীষা পরবশ হইয়া পড়ে

এবং জাতিই জাতির শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ভারতে মুসলমান-আক্রমণ সহজ হইয়াছিল। দেশদ্রোহী জয়চাঁদ স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। 'খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত' রাজ্যের ইহাই মহান্ দোষ। একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে আচার পদ্ধতিও এক হইতে পারে। ভারতে বৈদিক কাল হইতে জাতিকে এক করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ তাহার নিদর্শন। এই যজ্ঞদ্বয়ের তাৎপর্য্য সাম্রাজ্যস্থাপন ও জাতির একীকরণ। জাতি এক বৃহৎ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও ভারতে ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহাতেও স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। পরন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যও ধর্ম্মানুশাসন না মানিলে ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবে। বিচ্ছিন্ন জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। অনেক সময় একে অপরের শত্রুতা আচরণ করিয়া শক্তি ক্ষয় করে; স্বার্থে আঘাত প্রত্যেক পদ-ক্ষেপে সম্ভব হয়। ফলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়। মহাভারতে দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যে

পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন—জাতিকে বাঁচিতে হইলে এক হওয়া চাই। ইহাই মূল-মন্ত্র করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা। ইহার জন্যই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ। সমস্ত রাজন্যবর্গের বিরোধ মিটাইয়া এক পতাকাতলে আনিয়া, এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের উদ্যম। মহাভারতে জাতীয় সত্তার উদ্বোধক শ্রেষ্ঠ আদর্শ সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাম্রাজ্য সংগঠনই জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাম্রাজ্য গঠনের প্রধান দোষ সাম্রাজ্যমদমত্ততা। কিন্তু ভারতের উপাদানে তাহার স্থান নাই। কারণ সাম্রাজ্যস্থাপনও যজ্ঞ এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং নারায়ণ। সমস্ত জাতিকে এক শাসনের তলে আনিতে না পারিলে, একভাবে ভাবিত করিতে না পারিলে, এক অনুপ্রাণনায় উন্মাদিত করিতে না পারিলে, এক মহামন্ত্রের অনুরণনায় জাতীয় জীবনে ঝঙ্কার না দিলে, জাতি বাঁচিতে পারে না। একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইলে জাতির ভাব অনেকাংশে এক হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। এ ক্ষেত্রে জলে জলের মত, আকাশে আকাশের মত মিলন সাধিত

হইতে পারে না। এক সূত্রকে কেন্দ্র করিয়া মিছরির স্তূপের ন্যায় এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে। অতএব রুশোর মত এ অংশে অগ্রাহ্য।

জর্ম্মন্ দার্শনিক হেগেলের মত স্বভাববাদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতবাদ অনেকাংশে উপাদেয়। তাঁহার মতের সহিত ভারতীয় মতের কোন কোনও অংশের সাদৃশ্য আছে। আমরা নিম্নে তাঁহার মতবাদ প্রদান করিলাম।

দার্শনিক হেগেলের মত—"মনই নৈতিক বস্তু। এই মনই পরিবার, সমাজ ও সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে। রাষ্ট্র নৈতিক আদর্শের মূর্ত্তস্বরূপ, বা পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ভগবানের কর্ম্মস্রোত আমরা রাষ্ট্রেই প্রবহমান দেখিতে পাই। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র আপন স্বভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনাও যেমন অপ্রাসঙ্গিক সেইরূপ ব্যক্তি বিশেষের গঠনের চেষ্টাও অস্বাভাবিক। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নহে যে, ব্যক্তিবিশেষ খামখেয়ালে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবে। শাসন করিবার ক্ষমতা জ্ঞানী এবং শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। এই

শিক্ষিত ব্যক্তিগণই বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষিত কর্ম্মচারী। হেগেলের মতে ভগবানের সত্তা এত ক্ষীণ নহে যে বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না। রাজ্য ও প্রকৃতির বাস্তবত্বে অনুপ্রবেশ ভগবৎসত্তার পক্ষে কঠিন নহে। নূতন আদর্শ গঠনই দর্শনের কার্য্য নহে। যে সমস্ত জীবন্ত ভাববস্তু উপলব্ধ হইয়াছে তাহাদের আদর্শ আবিষ্কার করাই দর্শনের কার্য্য।

হেগেলের মতের সমালোচনা—হেগেলের নৈতিক বস্তুই (Moral substance) স্বাভাবিক ভগবৎদত্ত আন্তরিক ভাব। তাই তাঁহার মতে রাজ্য ভগবানের কার্য্যের জাগতিক অভিব্যক্তি। ইহা আমাদের ভারতীয় ভাবের অনুরূপ। "রাজানমস্থজৎ প্রভুঃ" এই মনু বাক্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। জ্ঞানী ব্যক্তির শাসন সর্ব্বানুমোদিত। সকল দেশেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শাসন করেন। প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র সর্ব্বত্রই জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরাই রাজ্যের কর্ণধার। ইংলণ্ডের বংশানুক্রমিক সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রেও (Hereditary Limited Monarchy) শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিরাই প্রকৃত শাসক। ফ্রান্স ও আমেরিকার গণতন্ত্রেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা নায়ক ও শাসক। জর্ম্মন্‌রাজ-

তন্ত্রেও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পরিচালক। জ্ঞানীর রাজ্য চালনা ও শাসন স্বভাবসিদ্ধ। মন ইন্দ্রিয়গুলিকে চালনা করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার অনেকাংশে সাধিত হয়। মস্তিষ্ক স্নায়ু-মণ্ডলের পরিচালক—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্য জ্ঞানবলে পশু পক্ষিগণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। বুদ্ধিই চালক ও শাসক। এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবলেই ভারতে ব্রাহ্মণ শাসনযন্ত্রের মন্ত্রী ও সদস্য। তাহাদের ও রাজার গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হইবে—ভারতীয় বিধিতে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই শাসক। ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির শাসন (Oligarchy) নহে। ইহা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—'প্রজার স্বাভাবিক প্রতিনিধিগণের শাসন'।

• কিন্তু দার্শনিক হেগেলের প্রতিপাদিত 'বুরোক্রেশির' বা কর্ম্মচারীশাসনের আমরা তীব্র বিরোধী। ভারতীয় অনুশাসনে ইহাদের স্থান অতি নিম্নে। কর্ম্মচারীর শাসন কখনও মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। কর্ম্মচারী অর্থের দাস; সে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে। ভারতীয় বিধানে দেখিতে পাই, রাজা প্রজাগণকে কর্ম্মচারীবর্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন।—"কায়স্থৈশ্চৈব বিশেষতঃ" এই

কায়স্থগণ রাজ কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারী অপরাধ করিলে তাহার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাও দেখিতে পাই। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব। এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য.কর্ম্মচারীর শাসন ভারতীয়·মতে স্থান পায় নাই। ভারতে রাজা হইতে সামান্য গ্রামাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মানুশাসনের বলে চলিতে বাধ্য। ধর্ম্মানুশাসকই প্রকৃত শাসক। দেশাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ প্রভৃতি রাজ-কর্ম্মচারিবর্গ শাসনের অংশমাত্র, ইহারা প্রকৃত শাসক নহে। কর্ম্মচারী চাকুরীর জন্য লালায়িত,অর্থের লালসায় কর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহার পক্ষে অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এই জন্যই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—In whatever city those who are to govern, are the most averse to undertake Government, that city, of necessity, will be the best established and the most free from sedition" অর্থাৎ "যে নগরে শাসনকর্ত্তাগণ শাসনভার গ্রহণের জন্য লালায়িত নহে সেই নগরই সুন্দররূপে স্থাপিত ও রাজদ্রোহ পরিশূন্য হইবে।"

বাস্তবিক যাহারা চাকুরী পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ

করে তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে না। 'লোক ঠেঙ্গান' তাহাদের ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়; তাই কর্ম্মচারীর শাসন কোনমতেই সুফলপ্রদ হইতে পারে না। স্বার্থ যাহাদের অস্ত্র, অর্থ পিপাসা যাহাদের কর্ম্মের প্রাণ, তাহাদের নিকট সুশাসন প্রার্থনা অরণ্যে রোদনের ন্যায়। ইংলণ্ডের দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বুরোক্রেশিকে সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। জনমতের কর্ত্তৃত্বাধীনে কর্ম্মচারিবর্গের শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে বিধান দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই —"এ যুগের রাজনৈতিক সমস্যা—গণতন্ত্র ও কর্ম্মচারিতন্ত্রের বিরোধ। এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইলে জনসাধারণ কর্ম্মচারিবর্গকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্যের উপর সাধারণ ভাবে কর্ত্তৃত্ব রাখিবে।" আমাদের মনে হয় এইরূপ কর্ত্তৃত্ব রাখিলেও কর্ম্মচারীর অযথা অত্যাচার নিবারিত হওয়া সুকঠিন, অবশ্যই এই উপায় মন্দ নহে। বাস্তবিক হেগেলের মত এই অংশে আদপেই গ্রাহ্য নহে। কর্ম্মচারিবর্গ ধর্ম্মের রক্ষক মাত্র—এই ভাব না থাকিলে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা সমধিক। ধর্ম্মের অনুশাসন না মানিলে লক্ষ লক্ষ আইন করিয়া ও তাহাদের উপর

সাধারণ কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত রাখা কষ্টকর। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার মিলনে ধর্ম্মপ্রাণতা আসে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মকল্যাণ সাধিত হইবে এই বোধে এবং চিত্তের ভালবাসায় ও কর্ত্তব্য বোধের প্রেরণায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্মচারী যখন মনে করে রাজকার্য্যে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে, তখনই প্রকৃতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, অত্যাচার প্রশমিত হয়, উৎকোচ গ্রহণ রুদ্ধ হয়। ভারতীয় শাস্ত্রে উৎকোচ-গ্রাহীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। বিধি পালন না করিলে কোন প্রকারেই অযথা ক্ষমতা প্রয়োগ নিবারিত হইতে পারে না। এই জন্যই ভারতে ধর্ম্মবিধির এত প্রাধান্য। কর্ম্মচারিতন্ত্র বহুদোষের আকর। অতএব উহার সমর্থন করা যায় না। কর্ম্মচারীকে শাসনের অংশমাত্র রূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। জনসাধারণ পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি হয় না। তাহারা গুরুতর রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বিচার করিতে পারে না। অনেক সময় প্রবলের অত্যাচারে তাহারা প্রপীড়িত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি তাহার অধিকারে স্বাধীন না হইলে প্রবলের অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সাধারণের মত অনেক ক্ষেত্রে ভাবপ্রসূত।

উহার যৌক্তিকতা থাকে না। তাই প্রবল উপহাসচ্ছলে তাহার মত অগ্রাহ্য করে। বুদ্ধির প্রখরতা না থাকাতে মতের স্থিরতা থাকে না। প্রবল ব্যক্তিরা অনায়াসে অত্যাচার করে। ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা প্রকৃত উপকার না করিয়া অপকার করিতেছে—এই ধারণায় মহাপ্রাণ দার্শনিক কোম্‌টে তাঁহার মত প্রচার করিয়াছেন। অর্থশালী দরিদ্র শ্রমজীবির মুখের গ্রাস বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাড়িয়া লইতেছে। এই সকল দেখিয়া প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) কোম্‌টে সমাজ-তন্ত্র-বাদের উদ্‌ঘোষণা করেন। সেণ্ট সিমন্‌ও (Saint Simon) এক্ষেত্রে তাঁহার সমর্থক ও সহযোগী। তিনিও ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিরোধী। কোম্‌টের মত অতিশয় ভাবপ্রবণ ও কাল্পনিক, কিন্তু প্রাণ আছে। আমরা নিম্নে তাঁহার মতের সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম। তথাকথিত হিতবাদের (Utilitarianism) বিরুদ্ধেই সমাজ-তন্ত্রবাদী কোম্‌টে ও সেণ্ট সিমনের অভ্যুত্থান। মিলের মত আলোচনা প্রসঙ্গে হিতবাদ আলোচিত হইবে।

অগস্ত কোম্‌টের মতের সারাংশ—"বিশ্ব-মানবের আদর্শই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ব্যক্তি ও সমাজের

উন্নতি ইহার অধীন। কোম্‌টের মতে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যে ও সাধারণের কর্ত্তব্যে কোনও পার্থক্য নাই। ইহার পৃথক্‌ত্ব স্বীকার আধুনিক চিন্তার ফল। গ্রীক্ ও মধ্য যুগের মনীষিগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। প্রত্যক্ষবাদের ইহাই সর্ব্বপ্রধান আদর্শ যে, এমন একটী ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার অনুবলে সকলে নিজকে বিশ্বমানবক্ষেত্রের অংশ বলিয়া মনে করিবে। দাসপ্রথা নিবারিত হওয়াতে শ্রমজীবি-গণকেও সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পরবর্ত্তী 'পলিটিক্ পজিটিভ্' নামক গ্রন্থে কোম্‌টে নূতন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। এই ধর্ম্ম বিশ্বমানবের ধর্ম্ম। Cour নামক গ্রন্থে বহির্জগৎ বা বহিঃপ্রকৃতিকে মূল করিয়া মানবের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির জ্ঞানে মানবকে বুঝিতে চেষ্টিত ছিলেন। এই পরাচীন ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ ভাবকে বরণ করিলেন। মানবকে দিয়াই বহিঃপ্রকৃতির বিচার করিতে হইবে। বিশ্ব-মানবই পরমপুরুষরূপে সাব্যস্ত হইল। কেবল বুদ্ধি নহে, স্নেহও বিচারকের স্থান গ্রহণ করিবে এবং

সঙ্কলন অর্থাৎ একত্বের বোধ, বিকলন ও বিশেষীকরণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। এই নূতন ধর্ম্ম বিশ্বমানবের উপাসনা। এই পূজায় সকলেই অধিকারী। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানবংশীয় সকলেই উপাসনার অধিকারী। সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা এই পরমপুরুষভাবের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত করিতে হইবে। ভবিষ্যতের শাসনশৃঙ্খলা সামাজিক সাম্রাজ্যে (Sociocracy) পরিণত হইবে। সামাজিক সাম্রাজ্য একটি সঙ্ঘ। ইহাতে কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে না। আভিজাত্য সম্প্রদায় উৎপাদনের (Production) ব্যবস্থা করিবেন; শ্রমজীবি গতির, দার্শনিক বিচারের এবং স্ত্রীলোক সমাজের স্নেহের নিদর্শনরূপে অবস্থিত হইবে। পুরোহিত ও শাসন-কর্ত্তাগণের শক্তির অপব্যবহার নিরোধ করিবার জন্য সাধারণ জনমত প্রবল থাকিবে এবং সাহচর্য্যে অস্বীকার প্রতিবন্ধকরূপে কার্য্যকরী হইবে।”

কোম্‌তের মতের সমালোচনা—সমাজতন্ত্র বা সামাজিক সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় যথেষ্ট বিদ্যমান। আজকাল সমাজতন্ত্রবাদ ইউরোপে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী; আমাদের দেশেও এই মতবাদ

বিস্তার লাভ করিতেছে। বিশ্বপ্রজাবাদ (Cosmopolitanism) ও সমাজতন্ত্রবাদের ভাবে (Socialism) আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথও ভাবিত। বিশ্বমানবকে এক করিবার চেষ্টা অতীব শোভন; কিন্তু সম্ভবপর কি না তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কথাগুলি মুখরোচক বটে; কিন্তু হজম হইবে কি না তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এক সময়ে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছে; বৌদ্ধের সাম্যবাদ হইতে বিশ্বপ্রজাবাদী বা সমাজতন্ত্রীর সাম্যবাদ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু বৌদ্ধের সাম্যবাদ সঙ্ঘে পরিণতি লাভ করিল। তাহারা দল ভাঙ্গিতে গিয়া দল বাঁধিল।

ফরাসীবিপ্লবের মূলমন্ত্র (১) মনুষ্য স্বাধীন জীব, (২) মনুষ্যেরা পরস্পর তুল্য, (৩) মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এই মতবাদের উপরেই ফরাসীবিপ্লব। ইহাতে প্রজার উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রজার হিতসাধনের মহতী শিক্ষা ফরাসী বিপ্লবের ফল। কিন্তু যে বৈষম্য বিদূরিত করিবার জন্য এত রক্তারক্তি, এত জীবনপাত, সেই বৈষম্যই নূতন আকারে জন্মাধিকারের পরিবর্ত্তে ধনাধিকারে পরিবর্ত্তিত হইল। মার্কিণের যুক্তরাজ্যে সাম্যবাদ প্রবল। সে স্থানে জমিদার নাই। কিন্তু

'King Dollar'ই রাজা। ধনাধিকারে মার্কিণের সাম্যবাদ বিধ্বস্ত হইয়াছে। মার্কিণের শাসনতন্ত্র বৈশ্যশাসনতন্ত্র (Timocracy) বলিলেও অন্যায় হইবে না। দরিদ্রের অবস্থা মার্কিণে শোচনীয়। কেবল ভোটাধিকার থাকিলেই মানুষ মানুষ হয় না; প্রবলের পেষণে দরিদ্র প্রপীড়িত হইলে তাহা কখনই সাম্যবাদের নিদর্শন নহে। ধনগর্ব্বে মত্ত ব্যক্তি সকল একচেটিয়া করিল আর দরিদ্র 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া ধনশালীর বিলাস-লালসায় ইন্ধন যোগাইল। ইহা সাম্যবাদ নহে, ইহা পরিপূর্ণ শোষণবাদ। ইংলণ্ডের সাম্যবাদও ইহার সদৃশ। অবশ্য ইউরোপীয় জাতির একটা গুণ বা দোষ আছে। 'নিজের দেশের সবই ভাল' এই ভাব ইউরোপীয় জাতির অস্থিমজ্জাগত। তাই দোষযুক্ত হইলেও নিজেদের রাষ্ট্রীয় মতবাদকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে। ইংলণ্ডে দরিদ্রের অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। ভিক্ষুকনিবাস ও দরিদ্রনিবাসেও (Alms-house and Poor-house) সেই নগ্ন দারিদ্র্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে নাই। অন্য জাতির প্রতি ব্যবহারেও বিজিত জাতির শাসনে ইউরোপীয় সাম্যবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের মনে হয় ইউরোপীয় সাম্যবাদ

কথার কথা। বিশেষতঃ বৈষম্যের উপর সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক। ইউরোপ বৈষম্য ভাঙ্গিয়া সাম্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী; প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গিতে গেলে সাম্য দাঁড়াইবে কেন? মৌলিক সাম্য জ্ঞানে। এই সাম্যই প্রকৃত সাম্য। কিন্তু সেই সাম্য উপলব্ধি করিতে হইলে আত্মজ্ঞান আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন অধিকারের সমতা রক্ষা করিতে পারে। ইহাতে ব্যবহারক্ষেত্রেও কতকটা সাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকারীবাদ না মানিলে সহস্র চেষ্টায়ও বৈষম্য ভাঙ্গিয়া সাম্য স্থাপিত হইতে পারিবে না। কঙ্গোতে রবার চাষের জন্য বেলজিয়মের অত্যাচার এবং ভারতে নীলকর, চা করের অত্যাচার, সাম্যবাদের কলঙ্ক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মুসলমানের সাম্যবাদের ফলে ভারতে আবার জাতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার ফলে নানকপন্থী, দাদুপন্থী, কবির-পন্থী প্রভৃতি পন্থের উদ্ভব হইল। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে পরিণত হইল। বর্ত্তমানেও থিয়োসফিষ্ট (Theosophist) সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টিত। কিন্তু সেও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ গণ্ডী ভাঙ্গিতে গিয়া—'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' বিকাশ

করিতে গিয়া দল বাঁধিয়াছেন। ইউরোপে সাম্যবাদের উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্যে, ধনশালীর প্রবল অত্যাচারে শ্রমজীবি ত্রস্ত। ইহার ফলই ধর্ম্মঘট। এখন সঙ্ঘও স্থাপিত হইতেছে। শ্রমজীবিসঙ্ঘ, ব্যবসায়ীর সঙ্ঘ ইত্যাদি। জাতীয়তা রক্ষার জন্য—বলকানে (Bal-kans) প্রভুত্বের জন্য—বিদেশীর শস্যসম্পদ ও ধনসম্পদ বাণিজ্যের প্রসারে কুক্ষিগত করিবার জন্য, চারিদিক হইতে জাতিগত, ভাষাগত বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। ইউরোপে সাম্যবাদ নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। রুশিয়া, শ্লাভ্ (Slav) জাতিকে এক করিতে উৎসুক। জর্ম্মন্ টিউটনিক্ জাতিকে এক করিতে ব্যস্ত, ফরাসী কেল্টিক জাতিকে এক করিতে সমুৎসুক; ইংরেজ ভাষার গণ্ডী দিয়া ইংরেজী-ভাষা-ভাষী জনসমূহকে একছত্রতলে আনিতে ব্যস্ত।

ইহাই ইউরোপীয় সাম্যবাদের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিজিত ও বিজেতায় কখনও সাম্যবাদ সম্ভব হয় না। এই সাম্যবাদ অনেক পরিমাণে "মুরগী পোষার মত"। খাওয়াইয়া বড় করিলে শেষে ঘাড় ভাঙ্গিতে পারা যাইবে। ভৌগোলিক সংস্থানেও মানুষ বিভিন্ন হয়। জন্মগত বৈষম্য আছে। শাসন-বৈচিত্র্য মানুষের

বিচিত্রতা অনিবার্য্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও মানুষকে বিভিন্ন করিয়া তোলে। জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক ধারাও বিভিন্ন। শিক্ষা দীক্ষা বিভিন্ন। মানসিক গঠন ও উপাদান ভিন্ন। এমতাবস্থায় সমস্ত মানব সমাজকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা মরীচিকায় জল অন্বেষণের ন্যায় বিফল। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের বিভিন্নতা আছে। সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষকে রক্ষা করিতে হয়। মানুষ একখণ্ড কাষ্ঠ নহে যে, কাষ্ঠখণ্ডকে যে ভাবেই ইচ্ছা পরিণত করা যাইবে। বাস্তবিক কাষ্ঠখণ্ড সম্বন্ধেও এ নিয়ম খাটে না। সেগুন, বাহাদুরি, চাম্বল, লোহা ও সুন্দরী কাষ্ঠ সকল সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। সকল কাষ্ঠ দ্বারাই সমান ভাবে সকল কার্য্য করা যায় না। একখানা কাষ্ঠে অন্য একখানা কাষ্ঠ মিশান যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে ফাঁক থাকিবে। মানুষ জীবন্ত জীব। দুই রকমের মানুষকে এক করা অসম্ভব। আদর্শের বিভিন্নতায় মানুষের মন বিভিন্ন। এমতাবস্থায় এক বস্তুতে পরিণত করা অসম্ভব। এক শাসনতলে আনিতে হইলেও ঐতিহাসিক ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির ঐক্য চাই। কোনওরূপ ঐক্য না থাকিলে এক শাসনতলে

সমবেত করাও সুকঠিন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় (Botany) এক জাতীয় দুই রকমের বীজ হইতে একটি সবল গাছ উৎপন্ন করিবার প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়; ইহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন দুই জাতীয় মানবও এক হইতে পারে। অবশ্যই উদ্ভিদ্‌বিদ্‌কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। এক জাতীয় দুই রকমের বীজে একটি সবল গাছ হইতে পারে, কিন্তু ভিন্নজাতীয় দুইটি বীজে একটি গাছ উৎপন্ন হইতে পারে কি? আম ও কাঁঠাল মিলিয়া এক গাছ হইতে পারে কি? বৃক্ষ সকলেই একজাতি, কিন্তু আম ও কাঁঠালে বিজাতীয় ভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ রহিয়াছে। উভয়ের উপাদান বিভিন্ন। আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি, তিনি সকল দেশে সকল শস্য সমানরূপে জন্মাইতে পারেন কিনা? কোনও ভূভাগে কোনও বস্তু আকারে বৃহৎ হয়, অন্য প্রদেশে সেই বীজ বপন করিলে ছোট হয় কি না? উদ্ভিদ্‌-বিদ্‌কেও প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হইবে। একজাতীয় দুই রকমের বীজ হইতে নূতন কিছুই তৈয়ারী হয় না। পরস্পরের আদান প্রদানে একটি সবল গাছ উৎপন্ন হয়, এই মাত্র। বেগুনের বীজে আম্র হইতে পারে না। দাবদগ্ধ বেত

হইতে কলা গাছের উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংসর্গ ব্যতীতও নূতন নূতন বীজাণুর বিস্তার করে (A Sexual Production)। যাঁহারা প্রাণিবিদ্যায় ও বীজাণু-বিদ্যায় (Biology and Bacteriology) পারদর্শী তাঁহারাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। বাস্তবিক সংসর্গ ব্যতীত এই প্রসবাত্মিকা শক্তিও প্রাকৃতিক। কারণ মানবের ক্ষেত্রে স্ত্রীবীজ (Ovum) ও পুংবীজের (Spermatozoon) সম্মিলন ব্যতীত কিছুতেই সন্তান উৎপাদিত হইতে পারে না। এই প্রাকৃতিক বৈষম্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। ক্রমোন্নতিবাদীরা ইহাকে ক্রমোন্নতির ফল বলেন। যাহাই হউক বিভিন্নতা আছে। মানবীয় মনের গঠনেও বিভিন্নতা আছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মনের ভিন্নতা প্রকৃতিসিদ্ধ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবেই মানসিক বিকাশের তারতম্য বিদ্যমান। বৃক্ষ লতায়ও মানসিক বিকাশের তারতম্য রহিয়াছে। প্রকৃতির অন্যথাভাব হইতে পারে না—"প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চন ভবিষ্যতি"।

প্রাণিবিদ্যায় দেখিতে পাই প্রাণে ও জড়ে বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছে ; জড়কে পরাভূত করিবার জন্য প্রাণের

চেষ্টা চলিতেছে। এই দ্বন্দ্ব প্রাণরাজ্যে নিয়তই চলিতেছে। মানবের এইরূপ দ্বন্দ্বও অনিবার্য্য। কেবল আত্মস্থ হইলেই সকল দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বক্ষে সকলেই আত্মস্থ হইতে পারে কি? অতএব বিশ্বমানবের সাম্রাজ্য একটা অস্বাভাবিক উদ্ভট কল্পনা। স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত রহিয়াছে। সকল জাতি এক হইতে পারে না। সকল জাতি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবাপন্ন ও সমান উন্নত হইলে বিশ্ব-মানবসাম্রাজ্য সম্ভব হইলেও হইতে পারিত; কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রতিভা বিকাশেরও একটা ধারা আছে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই সমাজের প্রাণস্বরূপ। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান হয় না। জাতির একত্ব বিধানে যাহারা পারগ, তাহা-দেরও সমতা না থাকায় এক অখণ্ড বিশ্বমানব-সাম্রাজ্য কল্পনাপ্রসূত। উহার বাস্তবত্ব নাই।

বিশ্বমানব বলিতে একটা ভাব চিত্তক্ষেত্রে আসিতে পারে; কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এক একটা সীমা আসিবেই। দেশ, জল, পর্ব্বত প্রভৃতির গণ্ডী আসিবেই। জাতিগত, বর্ণগত পার্থক্য মানস-নয়নে ও বাহিরেও প্রত্যক্ষীকৃত হইবে। চিত্তচিত্রে যে ধারণার

অভিব্যক্তি হয়, তাহা নিয়া কার্য্য করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় ইহা আদপেই কার্য্যকরী নহে। অধিকন্তু জ্ঞানী সর্ব্বাত্মদর্শীর নিকট "বিশ্বমানব" বলিয়া কোনও বস্তু নাই। সর্ব্বাত্মদর্শী এক ব্রহ্মবস্তুই নিরীক্ষণ করেন। ব্রহ্মবস্তু সম, একরস ও নানাত্বপরিশূন্য। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা এই ভেদ তাহাতে নাই। এক অখণ্ড ব্রহ্ম-বস্তুই বিভাত হন।

বহির্জগতের ভিন্নতা এবং মানসিক ভিন্নতার লোপ হয়। জ্ঞানী আত্মবস্তুই উপলব্ধি করেন। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে জ্ঞানীও নানাত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। একজন পরমহংসও প্রাকৃত ব্যক্তির পার্থক্য রক্ষা করিতেছেন। জগতের স্থিতির জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদানের জন্য, জীবন্মুক্ত অবস্থায় বাহিরের ভেদকে স্বাপ্নিক সত্তার ন্যায় মিথ্যা-বোধে ব্যবহার চালাইয়া যাইতেছেন। "ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ"। এই বাক্য সর্ব্বদাই স্বীকার্য্য। জ্ঞানীর নিকটও 'তাই বিশ্বমানব বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত স্থাবর অস্থাবর সমস্তেই

যিনি একত্ব দর্শন করিতেছেন তাহার পক্ষে বিশ্বমানবের পূজা—কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত। বিশ্বমানবের পূজা উদ্ভট কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। একজাতি বলিতে, এক ভাষাভাষী বলিতে, এক ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিতে একটা কার্য্যকরী ধারণার উদয় হয়। একদেশবাসী বলিতেও কার্য্যকরী ধারণার সম্ভব। বিশ্বমানবের ধারণা খণ্ডিত গণ্ডী ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যকে বিশ্বমানব বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে না, ধারণার গণ্ডী আসিবেই। বিশেষতঃ কার্য্য-ক্ষেত্রে খণ্ডিত ভাব অবশ্যম্ভাবী। কোম্‌টে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকল মানুষ লইয়াই বিশ্বমানবের কল্পনা করিয়াছেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ থাকিলেও, বর্ত্তমান অতীতের সহিত কোন কোনও অংশে বিরোধী ও বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে। মানুষের ধারণার 'অদল-বদল' নিয়ত চলিতেছে। এমতাবস্থায় ধারণার পরিবর্ত্তনে উপাসনার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইবে। উপাসনার ধারা পরিবর্ত্তিত হইলে সকলের পূজার ধারার প্রকারের ভেদ সুনিশ্চিত। প্রকারের ভেদ ঘটিলে বিভিন্নতা অনিবার্য্য। 'বিশ্বমানব-পূজা' অবশ্যই মনোরাজ্যের

ব্যাপার। মনোরাজ্যের ভিন্নতা অবশ্যই বাহিরের রাজ্যেও আত্মপ্রকাশ করিবে, এই ভিন্নতার বশে আবার গণ্ডীর উদ্ভব সুনিশ্চিত। দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতির প্রভাব মনোরাজ্যে সবিশেষ পরিস্ফুট। এইগুলি অতিক্রম করা সহজ সাধ্য নহে। যিশুও ইহুদির ন্যায় আহার বিহারে অভ্যস্ত ছিলেন, বুদ্ধদেবও তাৎকালিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক ব্যবহার ক্ষেত্রে এইগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব। কল্পনার সাহায্যে একটা আদর্শ দাঁড় করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ধারণা করিতে হইলে সমুদ্রের ভাগগুলি, দেশের ভাগ,পর্ব্বতের ভাগ, প্রাদেশিক ভাগ, নদনদীর ভাগসকল আমাদের মনে সহসা উদিত হয়। ইহা বাদ দিয়া আমরা পৃথিবীর ধারণা করিতে শিখি নাই। জাতির গণ্ডী দিয়াও মানুষকে ধারণা করি। বর্ণের গণ্ডীও দিতে হয়। এমতাবস্থায় পৃথিবীস্থ লোক-সমূহের সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে জাতির, বর্ণের, দৈহিক গঠনের, মানসিক শক্তির, ভাষার, আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা বোধ অবশ্যই আসিবে। অতএব

পৃথিবীর ধারণা আমাদের খণ্ডিত, মানব সমাজের ধারণাও খণ্ডিত। উপাসনা বা পূজা করিতে হইলে উপাস্য বস্তু সম্বন্ধে একটী ধারণা আবশ্যক। ধারণা যতই ব্যাপক হইবে উপাসনাও ততই উচ্চতর হইবে। বিরাটের উপাসনায় সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। যে স্থলে বিশ্বজগৎ তাঁহার শরীর—এই ভাবে ভগবানের পূজা করি, সে স্থলে কেবল পৃথিবীস্থ মানব তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে; জীবজড়াত্মক সকলই সেই বিরাট পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। দেশের অধিষ্ঠাতাও সেই বিরাট পুরুষ; কিন্তু সে স্থলেও দেশের নরনারী লইয়াই বিরাটের শরীর গঠিত নহে। দেশের যাবতীয় বস্তুরই অন্তরাত্মা তিনি। আমাদের মহাদেশ সম্বন্ধে ধারণা দেশদ্বারা অথবা মানচিত্রের রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। যে স্থলে সহজজ্ঞানে মহাদেশকে ধারণা করি সে ক্ষেত্রে মহাদেশ অনুভূতির বস্তু। বাহিরের বস্তুকে সহজজ্ঞানে দেখিতে গেলেও সে জ্ঞান খণ্ডিত হইবেই, দেশ কালের সীমা আসিবেই। অখণ্ড আত্মোপলব্ধি দেশ কালের অতীত, উহা প্রতীচীন (subjective), পরাচীন (objective) নহে। মহাদেশ পরাচীন বস্তু; উহার ধারণা করিতে ব্যাবহারিক জ্ঞান আবশ্যক, সহজ জ্ঞানে

যে ধারণা হয় তাহা কার্য্যকরী নহে; অতএব মহাদেশের জ্ঞান ব্যাবহারিক ও খণ্ডিত। বিশ্বমানবের ধারণাও আমাদের সেইরূপ খণ্ডিত। উচ্চে উঠিলে অনেক দূর দেখা যায়; নিম্নে নানা বস্তু আমাদের দৃষ্টি রোধ করে। কিন্তু মানবসমাজ বা পৃথিবীকে ধারণা করিতে সর্ব্বোচ্চ ভাব কি হইতে পারে? এক অখণ্ড ভগবৎ সত্তা সকলের অন্তরে বাহিরে—ইহা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই সম্ভব নহে। কিন্তু দার্শনিক কোম্‌টে (Comte) মানব-সমাজের পূজা দ্বারা ভগবৎ পূজার বিষয় নির্দ্দেশ করেন নাই। মানবের ভিতরে চরিত্রহীন, আততায়ী, অত্যাচারী প্রভৃতিও আছে; ইহাদের পূজা সম্ভব কি? বিশেষতঃ এইরূপ লোকের উপাসনায় লাভ কি? অতএব সর্ব্ব প্রকারেই বিশ্ব-মানব কল্পনাপ্রসূত। উহা বস্তুতন্ত্রহীন। এইরূপ আদর্শ মনোজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকরী নহে।

কোম্‌টে ব্যক্তিগত ও সমাজগত কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা স্বীকার করেন নাই—ইহা অতীব শোভন। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য সমাজের পক্ষেও তাহাই সত্য, ব্যক্তির সাধনায় ও সমাজের সাধনায় কোনও প্রভেদ নাই;

সমাজের সার্থকতা ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া নিজেও উন্নত হওয়া—ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির ধারাও অভিন্ন। রামচন্দ্রের বনগমনকালে কৌশল্যা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন ; মাতার প্রতি কর্ত্তব্য ও মাতৃ-বাক্য পালনের আবশ্যকতা দেখাইলেন। রামচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, পিতার আদেশ ও রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় ভাব এক বস্তুতে পরিণত। ভারতে এই ভাবের প্রাধান্যের জন্যই রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। "Charity begins at home" পরিবারই দয়ার আদি ক্ষেত্র—এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব ভারতে স্থান পায় নাই। নীতিশাস্ত্রও বলিয়াছে— "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। ভারতে গৃহস্থের পক্ষে জীব ও অতিথি-সেবায় তৎপর হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে স্বগ্রামে একজনও অভুক্ত থাকিলে দম্পতির ভোজন নিষিদ্ধ। এক গ্রাস অন্ন থাকিলেও অর্দ্ধগ্রাস দান করিতে হইবে। সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের সহিত নিজের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অবিরোধী। বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে কোম্‌টের মত উদার ও সমীচীন।

শ্রমজীবিগণকে সমাজের অঙ্গীভূত রূপে গ্রহণ করা তাঁহার উদারতার পরিচায়ক। হৃদয়ের মহত্ত্বে

মহীয়ান, প্রেমে বলীয়ান কোম্‌টে ইউরোপের শ্রবজীবিগণের দুর্দ্দশা ও ফরাসী দেশের অবস্থা দেখিয়া শ্রমজীবিগণকে সামাজিক অধিকার দানের জন্য ব্যস্ত। কোম্‌টের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমজীবিগণ সমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই ; ইহা হইতেই ইউরোপীয় সমাজের সঙ্কীর্ণতা বেশ বুঝা যাইবে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রত্যেক সমাজ নিজস্ব সামাজিকতায় সংহত। সকলেই বৃহৎ সমাজের অঙ্গ। মহাভারতে ব্যাধগীতায় ইহা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ব্যাধ স্বধর্ম্মপালন বিষয়ে যোগীরও উপদেষ্টা। গৃহস্থের কুলবধূও যোগীর উপদেষ্টা। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মে ও সমাজে বড়, কাহারও সামাজিক স্বাধীনতায় অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ভারতীয় সমাজ গঠনের ও ধর্ম্মের অনুশাসনের মূলে এই ভাবটী নিহিত রহিয়াছে। সকলেই রাষ্ট্রের অঙ্গ। শ্রমশিল্পী রাষ্ট্রের বা সমাজের সম্পত্তি (State Property) রূপে পরিগণিত হইত না। সেও সমাজের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিচিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, শ্রমশিল্পীর অঙ্গহানি করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। শিল্পিগণ গোলাম (Slave) ছিল না। সমাজে

তাহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। শিল্পিগণ ধনীর অর্থাগমের (Exploitation) যন্ত্ররূপে পরিণত হয় নাই। শ্রমশিল্পীও বিরাট পুরুষের অঙ্গ, সেও ভগবানের অংশ ও সমাজের উন্নতির অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র।

কোমটে ভবিষ্যৎকালে সামাজিক সাম্রাজ্য (Sociocracy) প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এই সাম্রাজ্য পরিচালনে কোনও বাঁধা নিয়ম (fixed institution) থাকিবে না; ইহাই তাঁহার অভিমত। এ অংশে তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মানবজাতি কখনও এক সামাজিক সঙ্ঘে পরিণত হইতে পারে না; বাঁধাবাঁধি নিয়ম বা বিধি পালন না থাকিলে সমাজের উন্মার্গ-গমন রুদ্ধ হইতে পারে না। আদেশ হইতে বিধি-পালন শ্রেষ্ঠ। বিধিপালনে কর্ত্তব্যের বোধ ও চিত্তের ভালবাসা থাকে। উহাতে প্রাকৃতিক বিকাশের অনু-কূলতা বিদ্যমান। এরূপ বিধান না থাকিলে মানব-সমাজ চলিতে পারে না। বিধানগুলির স্বাভাবিকতা রক্ষা করিলেই হইল। স্বাভাবিক বিধান না থাকিলে উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য, বালকও সংস্কারের বশে চলে, সংস্কারও একপ্রকার নিয়ম। সংস্কারের অনুবলেই মানবের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। মানবের পূর্ণতা লাভের

উপযোগী স্বাভাবিক উপায়ই বিধি। এই বিধি পালন না করিলে ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য্য, সমাজেরও সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য। বিধিপালন স্বাভাবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইউরোপ ধর্ম্ম-বিধি পালনকে অত্যন্ত পরাধীনতা বলিয়া মনে করে। তাহার প্রথম কারণ খৃষ্টানধর্ম্ম অনেকাংশে সাধারণের উপযোগী নহে; দ্বিতীয় কারণ, ইউরোপ বাণিজ্যপ্রবণ। বাণিজ্যপ্রবণ জাতি-সমূহ চুক্তিই বেশ বুঝে। বিধিপালনকেও চুক্তি বলিয়া মনে করে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি হইলেও ইহাদিগকে নিয়মিত করা একান্ত আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত কাম সর্ব্বনাশের আকর। এই বৃত্তিগুলি নিরোধের জন্য স্বাভাবিক উপায়ের প্রয়োজন; এই স্বাভাবিক উপায়গুলিই বিধি; এই বিধি পালন না করিলে মানবসমাজ চলিতে পারে না। এই বিধি পালন অধীনতা নহে। কারণ ইহারই ফলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। কাম ক্রোধের বশীভূত হওয়াই অধীনতা; কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে অবস্থানই স্বাধীনতা। অতএব এ অংশে কোম্‌টের মত অসঙ্গত। তাঁহার কল্পিত সামাজিক সাম্রাজ্যের মধ্যে নানারূপ পৃথকৃত্ব রহিয়াছে; এরূপ সামাজিক-

সাম্রাজ্য অসম্ভব। জাতির সংবদ্ধ হইবার উপকরণ যথেষ্ট। এক দেশ, এক অবস্থা, এক রাষ্ট্রীয় শাসন ও এক ঐতিহাসিক ধারা—এই সকল উপকরণের সাহায্যে জাতি এক হইতে পারে। কিন্তু বিশ্বমানবের বা মানবসমাজের সেরূপ কোনও উপকরণ নাই; তাহার উপর ভৌগোলিক বাধাও রহিয়াছে। গমনাগমনের প্রবল বাধাও আদান প্রদানের অন্তরায়। স্বার্থের ঘাত প্রতি-ঘাত আছে; ভাষাগত, ভাবগত বৈষম্য আছে। জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা এক হইলে জাতি এক হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বমানবের তাহা নহে। অতএব সামাজিক সাম্রাজ্যও উদ্ভট কল্পনা। এইজন্যই দার্শনিক হফ্‌ডিং (Dr. Harald Hoffding) তৎপ্রণীত Brief History of Modern Philosophy নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Thus the founder of positivism ends up as a utopian romanticist" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের স্থাপয়িতা পরিশেষে উদ্ভট কাল্পনিক হইয়া দাঁড়াইলেন।

কোম্‌টের মতে, জনসমূহের মতে ও জনসাধারণের একত্রে মিলিয়া কার্য্য করিবার অনিচ্ছায় ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারিত হইবে। কোনও নিয়ম না

থাকিলে বা মানদণ্ড (standard) না থাকিলে, কাহার উপরে সাধারণের মত গঠিত হইবে? সনাতন নিয়ম আছে বলিয়াই মানুষ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। মানবীয় ব্যাপারে একটী মানদণ্ড আবশ্যক। বিচার কোনও মানদণ্ড ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। জনসাধারণের সাহচর্য্য অস্বীকার করিতে হইলেও একটী কারণ থাকা দরকার—সে কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার। অপব্যবহারের মানদণ্ড কি? কোন্ নিয়ম বা সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে ক্ষমতার অপব্যবহার হইবে? এস্থলেও নিয়ম বা বিধি আসিয়া পড়িল। পক্ষান্তরে জনমতের মূল্য অনেক ক্ষেত্রে থাকেনা। জনমত অনেক সময়ে ভাবপ্রসূত, উহাতে উত্তেজনা থাকে, কিন্তু বিচারবোধ থাকে না। দশের মত ও নয়ের মত, ইহার কোন্‌টি গ্রাহ্য তাহাও বিবেচ্য। মতের দাসত্বও অনিবার্য্য। ধর্ম্মঘট প্রভৃতির উদ্ভবে সামাজিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার জনমতের উপরে নির্ভর করিতে পারে না। বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষেই অন্যায় ও ন্যায়ের নিষ্পত্তি সম্ভব। বাস্তবিক সাহচর্য্যের অস্বীকার অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়রূপে পরিণত হইতে পারে। এ অংশেও কোম্‌টের মতের অনুমোদন

করা যাইতে পারেনা। মোটামুটি কোম্‌টের মতে মহাপ্রাণতার আভাস আছে। যদিও করুণার ভাব তাহাতে বিশেষ পরিস্ফুট, তথাপি ঐ মত কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা দোষে দুষ্ট।

মিল্ ও হিতবাদ—জনষ্টুয়ার্টমিল্‌ও প্রত্যক্ষবাদী (Positivist)। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের একান্ত পক্ষপাতী। "On Liberty" নামক প্রবন্ধে তিনি ব্যক্তিত্ববাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মত বেন্থাম্ (Bentham) প্রভৃতি হিতবাদিগণের (Utilitarian) মতের বিস্তৃতি। কোন কোনও অংশে তিনি হিতবাদের সংস্করণ করিয়াছেন। হিতবাদে (utility) ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে, ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করে না, কিন্তু যাহাতে অধিক পরিমাণ লোকের অধিক পরিমাণে সুখ হয়, তাহাই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম। যাহাতে অধিক লোকের অধিক পরিমাণে দুঃখ হয় তাহা অধর্ম্ম—এই মত নিতান্ত অসার ও অসমীচীন। কারণ এই লক্ষণের অর্থ বিভিন্ন হইতে পারে এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেও নানারূপ পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অধিক পরিমাণ সুখ বলিলে

কি বুঝাইবে? অধিক কাল ব্যাপিয়া সুখ অথবা সুখের অধিক গভীরতা? আবার সুখের গুণগত তারতম্যও আছে; স্পর্শজনিত সুখ ও আস্বাদনের সুখ গুণগত ভিন্ন। আর অধিক সংখ্যক লোক বলিতে কোন্ লোকগুলিকে বুঝাইবে? ফরাসীবিপ্লবের উত্তেজিত জনসঙ্ঘের রক্ত পিপাসায় সুখ। এই জনসঙ্ঘ সংখ্যায় অধিক, পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় লোক রক্তপাতের বিপক্ষে। এই অধিক সংখ্যক লোকের সুখ-বিধান কি ধর্ম্ম হইতে পারে? আরও একটী কথা এস্থলে প্রণিধানযোগ্য। কি করিলে লোকের হিত হয়, ইহা নিরূপণ করিবার শক্তি সাধারণের নাই। চিন্তাশীল, বিদ্বান্, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও ইহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভুল করেন। এই জন্য প্রয়োগ কালে হিতবাদী (Utilitarian) আপন আপন মনঃকল্পিত পন্থাকেই লোক-হিতকর বলেন। ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে হিতবাদ নহে। কারণ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন তাহাই সাধারণকে করিতে উপদেশ দেন। এস্থলে অধিক সংখ্যার অবসর কোথায়? অতএব হিতবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে অসমীচীন ও অসঙ্গত। মিল্ এই হিতবাদের স্থানবিশেষে অসঙ্গতি পরিহার করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহার মতেরও

সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। দাশনিকের যে সকল ত্রুটি থাকা অমার্জ্জনীয় মিলের সেগুলি ছিল। কিন্তু মিলের সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে বুঝিতে পারেন নাই, যে স্থলে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, সে স্থলে তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই মিলের মহত্ত্ব। মিল্ কর্ম্মচারী-শাসন-তন্ত্রের (Bureaucratic Government) পক্ষপাতী, কেবল এই শাসনতন্ত্রের উপরে সাধারণের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের উপর ভিত্তি গঠিত না হইলে কোন প্রকারেই বুরোক্রেশি বা কর্ম্মচারিবর্গের অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বেকনের মত দার্শনিকও রাণী এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের সময় অত্যন্ত অনাচার করিয়াছিলেন। উৎকোচ-গ্রহণের জন্য তাঁহাকে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। মিল্ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; নিজেও এ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে নিজের অপারগতা স্বীকার করিয়াছেন। ব্যক্তি-বাদ (Individualism) ও সমাজ-বাদের (Socialism) সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং

বিন্দতি মানবঃ” ইহাই মূলমন্ত্র করিতে হয়। নিখিল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হইলে, তাঁহারই প্রীতির জন্য ও তদর্থে কৃত হইলেই কর্ম্ম ব্যাপক হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়; অবশ্য ইউরোপে এই মীমাংসা অদ্যাপি সাধিত হয় নাই। নিম্নে মিলের মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করা হইল।

মিলের মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—অল্পসংখ্যক লোকের স্বত্ব রক্ষার জন্য তিনি সমানুপাতিক ভোটাধিকারের পক্ষপাতী। মিলের ভবিষ্যৎ আদর্শ রাজনৈতিক গণতন্ত্রও অতিক্রম 'করিয়াছে। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না; তিনি ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমস্যা পূরণ করিতে না পারিয়া নিজের অপারগতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কি ব্যক্তিতন্ত্রবাদী কি সমাজ-তন্ত্রবাদী কোনও সম্প্রদায়েরই মৌলিক মত দার্শনিক বা ব্যাবহারিক হিসাবে শোভন রূপে বিবেচিত হয় নাই। বর্ত্তমানের আইন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিঘ্ন বৃদ্ধি করে। যদি আইন এই বিঘ্ন অপসারিত করে তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত

হওয়াই সমুচিত। প্রতিযোগিতাকে সমাজের অবনতির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদিগণ ভ্রান্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অবনতির প্রকৃত কারণ এই যে শ্রমজীবী অর্থশালীর অধীন। মিল্ ব্যবসায়ী ও শিল্পিসঙ্ঘ হইতে যথেষ্ট সুফল আশা করেন। কারণ ইহাতে ন্যায়পরায়ণতা ও সংযম প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তির উন্মেষ সাধিত হয়।

মিলের মতের সমালোচনা—নির্ব্বাচন প্রথার দোষের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক নেতার পরিবর্ত্তে অযোগ্য লোকই চেষ্টা করিয়া প্রতিনিধি হয়। ইহার ফলে প্রকৃতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, বিশেষতঃ সংখ্যার দাসত্বের উদ্ভব হয়। প্রায় সমসংখ্যক লোক বিপরীত মতাবলম্বী হইলে কোন্ পক্ষের মত গ্রাহ্য তাহা নির্ণয় করাও সুকঠিন, অনেক ক্ষেত্রে সমসংখ্যক লোকের মত কার্য্যকরী হয় না; অতএব ইহাকে সাধারণের মতও বলা যাইতে পারে না। উনিশ ও বিশের পার্থক্য অতি সামান্য। বিশের মতকে সাধারণের মতরূপে গ্রহণ করিয়া উনিশের স্বার্থ পদদলিত করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উনিশের পক্ষই

ন্যায্য হইতে পারে। অল্পসংখ্যক লোকের (Minority) রক্ষার জন্য (Safeguard) বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে মিল্ সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। নির্ব্বাচনপ্রথার অন্য প্রধান দোষ এই যে, সাধারণ জনসমূহ ভালমন্দ বিচার করিতে না পারিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষের মতানুযায়ী চলিতে বাধ্য হয়; সাধারণ লোক প্রায় সর্ব্বত্রই হুজুগপ্রিয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও মতের স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না— "ন চ ভ্যাচ্‌কা ন চ দৃঢ়"। জনসমূহ অনেক সময় ব্যক্তি-বিশেষের খামখেয়ালের যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। কেবল শিক্ষার ফলেই এই দোষ নিবারিত হইতে পারে না; শিক্ষিত লোকও তোষামোদ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। চরিত্রের উৎকর্ষই প্রধানতঃ আবশ্যক। প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ ভোটাধিকার অধীনতারই নামান্তর। বিলাতে কোনও লোক মহাসভার সভ্য হইবার জন্য জাহাজের কারখানা খুলিয়া দিলেন; সেই কারখানার শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারিগণের ভোটে তিনি মহাসভার সদস্য হইলেন, এই ভদ্রলোক কখনই জনসমাজের নেতা বা প্রতিনিধি নহেন। এইরূপ উপায়ে যে ব্যক্তি সদস্য হন তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ সম্বন্ধেও সন্দিহান হওয়া যাইতে পারে।

মিলের মতে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির উপরে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নির্ভর করে। আমাদের মনে হয় এই মতের সার্থকতা অতি কম। আর্থিক উন্নতিতে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হয়, এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে না। সামাজিক উন্নতি বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া নির্ণীত হইতে পারে না। সামাজিক আদর্শহীন হইয়াও জাতিবিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে উন্নত হইতে পারে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক জাতি সমুন্নত হয়। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইল না। প্রভূত শারীরিক বল সম্পন্ন ব্যক্তি অন্যকে বশে রাখিতে পারে। নৈতিক হিসাবে এই বলবান্ ব্যক্তি অতিশয় হীন হইতে পারে। বৈশ্যভাব বৃদ্ধি পাইলেই রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিত হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না। আমাদের মনে হয় ক্ষাত্রবীর্য্য ও ব্রাহ্মণবীর্য্যের বৃদ্ধিতেই রাষ্ট্রগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভব। মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক বলের আধিক্যে জাতীয় চরিত্র সমুন্নত হয়। জাতীর স্বাধীনতাও রক্ষিত হয়। ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সৌধ গঠিত হইলেই প্রকৃত ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত

স্বাধীনতা সম্ভব, অন্য ভিত্তিতে নহে। "ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্"—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই জগৎ প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালিত হয়। জাতির মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বল বৃদ্ধি পাইলেই জাতীয় স্বাধীনতা লাভ হয়। মিল্ সমাজতন্ত্রবাদিগণকে নিরাকরণ করিতে যাইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ধনশালী ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রমজীবি ও কৃষক সম্প্রদায়ের অপকার হইতেছে। অতএব আর্থিক উন্নতিতে ব্যক্তির ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হয়, এই মত তাঁহার নিজের পরবর্ত্তী মত দ্বারা খণ্ডিত হইল। সমাজতন্ত্রবাদীর অর্থের সমবণ্টন (Euqal distribution of wealth) সম্বন্ধীয় মতেও স্বাভাবিকতার অভাব। প্রতিযোগিতা দোষের নহে, প্রতিযোগিতায় উন্নতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে সকলের ধনসম্পত্তি সমান হইতে পারে না। কথাটি শুনিতে রুচিকর বটে কিন্তু এইরূপ সমবণ্টন অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য ও শ্রমশীলতা প্রভৃতির উপরে ধনোপার্জ্জন নির্ভর করে। সকলের সম্পত্তি সমান করিয়া দিলে বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির বিকাশ অবশ্যই রুদ্ধ হইবে। নৈপুণ্য প্রভৃতি সকলের সমান হয় না,

বুদ্ধির অল্পাধিক্য মানুষে বিদ্যমান। ধনের অল্পাধিক্যও স্বাভাবিক; কাহারও ধনার্জ্জনের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী, কাহারও কম। এইরূপ বৈষম্য মানবের আছে; সকলের সমবণ্টনও একপ্রকার অসম্ভব: কাহারও পরিবারে দশ, কাহারও বিশ আবার কাহারও দুইজন লোক থাকিতে পারে। এরূপস্থলে কাহাকে কত দিতে হইবে? আর যদি দেশের জনসংখ্যা ধরিয়া মাথা প্রতি অর্থ বিভক্ত করা যায়—আমরা বলিব তাহাও সম্ভব নহে, জনসংখ্যা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আরও, বালকের যাহা আবশ্যক বৃদ্ধের ও প্রৌঢ়ের তাহা আবশ্যক নহে, গড়পড়্তা ভাগ করিলেও সমবণ্টন হয় না। কোন মানদণ্ড না থাকাতে বিভাগ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব অর্থের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দোষাবহ নহে। শ্রমজীবি অর্থের অধীন। এই দোষ নিবারণ করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দরকার। অর্থের শক্তি আছে। অর্থবল শ্রমজীবীকে বশীভূত রাখিবে। ইহা কতকটা স্বাভাবিক। যাহাতে অত্যাচার নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে উটজ শিল্পের (Domestic industry) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রত্যেককে আপন অধিকারে

স্বাধীন করিয়া এক মহা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। মিলের ব্যবসায়িসঙ্ঘ ও শিল্পিসঙ্ঘ প্রভৃতির দোষগুণ উভয়ই আছে। এরূপ সঙ্ঘ স্থাপিত হইলে ধর্ম্মঘট প্রভৃতির উদ্ভব হয়। চুক্তিবাদ নামক মহাস্ত্র জাতিকে বিপ্লবপ্রবণ করিয়া তোলে। ধর্ম্মঘট প্রভৃতিতে অনেক সময় জাতির ও সমাজের ক্ষতি হয়। এই সকল সঙ্ঘের ফলে সংযম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার ভাব জাগ্রত হইলেও, কোন কোনও ক্ষেত্রে অন্যায়ই ন্যায়ের আকার ধারণ করে। ভারতীয় বিধানে শিল্পিগণ তাহাদের আপন সমাজে প্রধান, তাহাতে অন্যের অনধিকার প্রবেশ নাই, অন্যের বাড়াবাড়ি নাই। প্রত্যেক সমাজ নিজের ভাবে প্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয়-ভাবে এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, এক সূত্রকে কেন্দ্র করিয়া পুষ্পমাল্যের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। প্রত্যেক পুষ্প পৃথক হইয়াও এক সূত্রে সংবদ্ধ। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ আকাশে আকাশের মত, বায়ুতে বায়ুর মত, জলে জলের মত মিলিত মিশ্রিত হইতে পারে না; এক সূত্রকে কেন্দ্র করিয়া আপনার অধিকার রক্ষা করিয়া সংহত হয়। সঙ্ঘাতের প্রত্যেক অংশ পৃথক হইয়াও মৌলিক শক্তিকে এক অখণ্ড

বস্তুতে পরিণত হয়, সংহননের ধর্ম্মই এই। সমাজ-সঙ্ঘেও এই ধর্ম্মই স্বাভাবিক। ইউরোপে বণিগ্‌বৃত্তি ও শিল্পবাদের (Industrialism) ফলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনর্থ বিদূরিত করিতেই কোম্‌টে, শিল্পিসঙ্ঘ স্থাপন করিতে, বিশ্বমানবের পূজার প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সমাজতন্ত্রবাদী সমাজের পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভবশালী ব্যক্তিগণ বিলাসসাগরে ভাসিতেছে আর দরিদ্র শীতের পীড়নে, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইতেছে। শ্রমজীবিগণের জীবনপাতে বিভবশালীর ভোগের উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে এবং বিনিময়ে অতি কষ্টে তাহারা পুত্রকন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতেছে। এইরূপ অনাচার নিবারণ মানসেই মহাপ্রাণ কোম্‌টে (অস্বাভাবিক হইলেও) সামাজিক সাম্রাজ্যগঠন ও বিশ্বমানবের পূজা প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। শিল্পবাদের (Industrialism) বিষময় ফল ইউরোপে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুধু কলকব্জায় জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। নগরের নানা প্রলোভনে শ্রমজীবিগণ অনেক ক্ষেত্রে কলুষিত হয়। গ্রাম্য সমাজে উটজ শিল্পী স্বাধীন, তথায় নগরের

প্রলোভন নাই, উত্তেজনা নাই। গৃহের শান্ত প্রভাবে শিল্পী আপনার চরিত্র নির্ম্মল রাখিয়া সমাজের অভাব বিদূরিত করে, ইহাই ভারতীয় বিধান। ভারতেও শিল্পবাদরাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বনাশের কারণ। ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহের মূলে বণিগ্‌বৃত্তি ও শিল্পবাদ (Industrialism)। ইহাতে ইউরোপের সামাজিক জীবন প্রশান্তভাব পরিহার করিয়া উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট্ স্পেন্সারের মত আলোচনা করা সঙ্গত। তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সমাজতন্ত্রে স্পেন্সার জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলির উপরেই সবিশেষ জোর দিয়াছেন। আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টায় মানবের চরিত্র সমুন্নত হয়; ব্যক্তির প্রকৃত জীবনের গতি রোধ করিবার অধিকার কোনও সামাজিক শাসন বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাই। সমস্ত ব্যাপারটী চরিত্রের উন্নতি বিধানে পর্য্যবসিত বলিয়া ক্রমোন্নতি অতি মন্থর গতিতে সাধিত হয়। কোম্‌টে ও

মিল্ ক্রমোন্নতি, সম্বন্ধে যেরূপ আশা পোষণ করিয়াছেন, স্পেন্সার সেরূপ করেন নাই।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের সমালোচনা:—স্পেন্সারের মতে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা হইতেই মানুষের চরিত্র গঠিত হইবে। কোনও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন নাই। আমরা এক্ষেত্রে স্পেন্সারের অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসন মানবীয় চিত্তবৃত্তি বিকাশের সহায়। চিত্তের বৃত্তি বিকাশোন্মুখ হইলে প্রকৃতির অনুকূলতায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়; তাহাতে চরিত্রের মাধুর্য্যও প্রকটিত হয়। চরিত্রের স্বাভাবিকতা আমরা স্বীকার করি—অনুশাসনের গৌণতাও স্বীকার করি। অনুশাসন চরিত্র গঠনের সহায়। কারণ অনুশাসন বা বিধিগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অভিব্যক্তি। স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই বিধিপালন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি হইতেই যে চরিত্র গঠিত হইবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। জীবমাত্রই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে; উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকও বাঁচিয়া থাকিতে লালায়িত—মরিতে চাহে এমন জীব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উত্তেজনা বা কোনও উচ্চভাবের অনুপ্রেরণায় কেহ কেহ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস তাহাদের মনের কোণে লুক্কায়িত থাকাই সম্ভব। বাঁচিবার জন্যই যে মানুষ চরিত্রবান্ হইবে এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পেন্সারের এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

ইউরোপীয় মতের সমালোচনা করিতে হইলে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টোটলের মতের আলোচনা সবিশেষ প্রয়োজনীয়। এই মনস্বিদ্বয়ের মত আলোচিত না হইলে ইউরোপীয় রাজনীতি যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না। এরিষ্টোটলকে ইউরোপের রাজনৈতিক দর্শনের গুরু বলা যাইতে পারে। প্লেটোর চিন্তা ইউরোপ গ্রহণ করে নাই। তাঁহার মত অসম্ভব বলিয়া রাষ্ট্রীয় শাসনের অঙ্গীভূত হয় নাই; আমাদের মনে হয় ইহা অতীব অশোভন। দার্শনিক প্লেটোর চিন্তার ধারা ভারতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে এবং উহা যে আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে তাহা দার্শনিক কাণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। প্লেটোর বিধান তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত নহে, উহার বাস্তবত্ব আছে।

আমরা নিম্নে তাঁহার মতের সারাংশ প্রদান করিলাম।

প্লেটোর মতের সারাংশ—তাঁহার মতে রাষ্ট্র মানবের বৃহদায়তন প্রতিকৃতি। রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক ইতিহাসের সহিত মানবীয় প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান; রাষ্ট্রের ব্যবস্থাতত্ত্ব ও বিচারতত্ত্ব ব্যক্তিবিশেষের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের (Therapeutics) তুল্য। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা। মানুষ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—অতএব রাষ্ট্রনিয়ম ও সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। নীতিবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক জীবনযাপনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় মঙ্গল লাভ হইতে পারে। পক্ষান্তরে স্বাধীন ও উৎকৃষ্ট রাজ্যেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন সম্ভব। উৎকৃষ্ট রাজ্যে প্রকৃত নৈতিকজীবন যাপনই সর্ব্বোত্তম নীতি (Highest morality), রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির ধারা তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নানা প্রকারের অভাব হইতে শ্রমবিভাগের (Divison of Labour) উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রমবিভাগে

প্রত্যেকেরই একটী অধিকার আছে। প্রত্যেকের একটী নিয়মিত কার্য্যও আছে। ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মপালনই তাহার কর্ত্তব্য। এই ন্যায়ধর্ম্ম স্বাভাবিক অথবা বিচারজাত রাষ্ট্রেই প্রভূত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে রাষ্ট্র দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপিত, যাহার উদ্ভব স্বাভাবিক ও সহজ, যাহাতে চুক্তির বাধাবাধি নাই, যাহা জান্তব প্রকৃতির (Organic life) ন্যায় স্বভাবজ, সেই রাষ্ট্রেই ন্যায়ধর্ম্মের প্রভাব ও স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যক্তির জীবনে যাহা সত্য, জাতির বা রাষ্ট্রের জীবনেও তাহা সত্য। প্রত্যেকেরই নিজ অধিকারে থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সমীচীন, তাহাই ন্যায় (Justice)। "Every one ought to apply himself to one thing, relating to the city, to which his genius was generally most adapted &c. And that to mind one's own affairs and not to be pragmatical is Justice"—(Republic), অর্থাৎ যাহার যে কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহার সেই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নিজের কার্য্যে মনোযোগী হওয়া ও নানারূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ

না করাই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা। প্রত্যেকের স্বভাবজ কার্য্য করাই ধর্ম্ম। স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিলেই প্রকৃত ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারেই জাতিবিভাগ হইয়াছে। প্লেটো মানসিক বৃত্তি অর্থাৎ গুণের তারতম্য অনুসারে তিনটী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—দাস (Labourers), রক্ষক (Guardians) এবং চালক বা শিক্ষক (Leaders and Teachers)। প্রথমের ধর্ম্ম সংযম (Temperance), দ্বিতীয়ের সাহস ও সহনশীলতা (Courage and Fortitude) এবং তৃতীয়ের ধর্ম্ম জ্ঞান (Wisdom), আর সকলের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ন্যায়পরায়ণতা (Justice)। তাঁহার মতে justice বা ন্যায়পরায়ণতার অন্তরেই সংযম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। তিনি ধনী বা বৈশ্যের শাসনের (Timocracy) বিরোধী ; পক্ষান্তরে গণতন্ত্রেরও পক্ষপাতী (Democracy) নহেন। উহাকে তিনি Mob-rule বলেন। ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল জীবন অশেষবিধ অমঙ্গলের কারণ। সেই সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির হস্তেই যদি কোন রাষ্ট্রের শাসনভার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সে রাষ্ট্র পরিচালিত হইতে পারে না। তিনি Oligarchy বা মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির শাসনও সমর্থন করেন না।

তিনি অভিজাত তন্ত্রেরই (Aristocracy) পক্ষপাতী। এই অভিজাততন্ত্রের শীর্ষস্থানে রাজা (Monarch) থাকিলেও তাঁহার আপত্তি নাই। সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে তিনি প্রয়াসী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Meum et Tuum) ব্যবস্থা দিতে তিনি অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ যে সকল প্রজা কর্ম্মনিপুণ, যাহারা রাষ্ট্রের রক্ষক ও শাসক, তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকাই অভিপ্রেত; কারণ উহাই সকল বিরোধের সৃষ্টি করে। তাঁহার মতে সকল প্রজাকেই তাহার ব্যক্তিগত ভাব ত্যাগ করিয়া প্রকৃতরূপে রাষ্ট্রের অংশীভূত (Citizen pure and simple) হইয়া থাকিতে হইবে এবং শাসনকর্ত্তাগণ দার্শনিক, সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও লোকাভিরাম হইলেই সেই রাষ্ট্রের প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতে পারে। যথেচ্ছাচার শাসনের তিনি বিরোধী। তিনি ৫০৪০টী পরিবার নিয়া রাষ্ট্র গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন (The Laws নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ৩৫টী পরিবার নিয়া একটী বস্তি, ১২টী বস্তিতে একটী দল এবং ১২টী দল নিয়া একটী রাজ্য গঠিত হইবে। যথোচিত প্রতিষেধক উপায় গ্রহণ না করিলে ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় রাষ্ট্রও ধ্বংসোন্মুখ হয়।

ইহার প্রতিকারের উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিদান শরীর-তত্ত্বের (Physiology) সহিত অভিন্ন। যে স্থলে ধনী ও শিক্ষাভিমানী (Oligarchy) ব্যক্তি শাসন করে সে স্থলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য অবশ্যম্ভাবী। সাধারণতন্ত্রে লোকের সাম্য, বৈষম্যেরই নামান্তর; স্বাধীনতাও স্বাধীনতার আভাস মাত্র,—উহাকে পরাধীনতা বলিলেও চলে। ইহাকে বাসনায় জর্জ্জরিত, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম মানুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ যেমন বাসনার বশে অন্ধ হইয়া শক্তিহীন হয়, সেইরূপ গণতন্ত্রও যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যথেচ্ছাচারই অধর্ম্ম বা অতি নিকৃষ্ট শাসন। তাঁহার মতে দার্শনিকই আইন প্রণয়নে অধিকারী। শাসনকর্ত্তা দার্শনিক হইলে তিনি উত্তম নিয়মগুলি প্রবর্ত্তন করিবেন। তাহাতে আইনের জাল পাশে বাঁধিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। তিনি Republic নামক গ্রন্থে জাতিকে ঐশ্বর্য্য ও কর্ম্মানুযায়ী তিন শ্রেণীতে ও Laws নামক গ্রন্থে মানসিক বৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। এই উভয়বিধ বিভাগের মধ্যে Republic এর শ্রেণী বিভাগই উৎকৃষ্ট।

Laws নামক গ্রন্থে পাপের বিভীষিকা অত্যধিক পরিস্ফুট।

প্লেটোর মতের সমালোচনা—প্লেটোর মত সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেই ভারতীয় মতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে; মনে হয় যেন উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান চলিয়াছে। প্লেটোর উদারতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও প্রাণের সজীবতা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন করে। প্রথমতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ স্বভাবজ, ইহা সুসঙ্গত ও শোভন। জান্তব প্রকৃতির অনুকূলতায় রাষ্ট্রের উদ্ভব। স্বাভাবিকতাই রাষ্ট্রের জন্মভূমি। গাঁদা-ফুলের পাপড়িগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ঔপনিবেশিক ভাবে অবস্থিতির জন্য অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে না। বালকগণের খেলার সাথী আপনা হইতেই জুটে। পরস্পরের মিলনমন্দির গড়িবার জন্য তাহাদের মাথা ঘামাইতে হয় না। স্বাভাবিকতাই রাষ্ট্রের প্রাণ। ব্যক্তি নিয়াই রাষ্ট্র গঠিত। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির ধর্ম্ম, রাষ্ট্রে অবশ্যই থাকিবে। সমষ্টি ব্যষ্টিকে গ্রহণ করিয়াই অবস্থিত। জাহাজের বহরে জাহাজের সাধারণ ধর্ম্ম বর্ত্তমান, পক্ষীর দলে পক্ষীর সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান। সাধারণ ধর্ম্ম না থাকিলে সংহনন হয় না। আকর্ষণ

ভিতরের। ভিতরের আকর্ষণে সমাজ ও রাষ্ট্র আপনা হইতে উদ্ভূত হয়। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহাই সত্য। ব্যক্তি দিয়াই জাতি গঠিত,সমষ্টির উপরই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতার উপরেই ধর্ম্ম নির্ভর করে। এই প্রকার সারবান্ কথা শুনিলে শরীর ও মন পুলকিত হয়। যে রাজ্যে উপদ্রব, সে রাজ্যে শাসনের বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য। যে রাজ্যে ব্যসন, সে রাজ্যে ধর্ম্মানুশীলন হইতে পারে না। অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম অসম্ভব। অরাজক রাজ্য কখনই মঙ্গলের নিদান নহে। বুদ্ধির স্থিরতা না থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মের ফল রাজাও গ্রহণ করেন, ইহা ভারতীয় শাস্ত্রের মূল মন্ত্র। প্রজার পাপপুণ্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—রাজা রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয়, অতএব ধর্ম্মের সহায় বলিয়া রাজার ফললাভ হয়। পরাধীন ও অরাজক দেশে ধর্ম্ম হইতে পারে না। যথেচ্ছাচারে জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়। পরাধীন জাতি নিজের কল্পিত হীনতায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কারণ দুর্ব্বলের ধর্ম্ম হইতে পারে না; ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ—সত্য, বহিরঙ্গ—আচার। সত্যোপলব্ধি

রাজনীতি।

বুদ্ধির ধর্ম্ম। পরাধীন ভৃত্যের বুদ্ধি মলিন হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার পক্ষে সত্যোপলব্ধি অসম্ভব। সর্ব্বত্রই প্রাণে স্ফূর্ত্তি আছে। কিন্তু কেনা গোলামের বা চুক্তিবদ্ধ গোলামের জীবন নিষ্প্রভ। আচার আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসা না থাকিলে আচার পালন অসম্ভব; পরাধীন বদ্ধ,—তাহার শক্তি নিয়ন্ত্রিত। ধর্ম্মের আচার স্বাধীনতা চায়, ব্যাপ্তি চায়, সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আপনার মহিমায় মহিমান্বিত হইতে চায়। পরাধীনের পক্ষে ইহা অসম্ভব। পরাধীনের আচার সঙ্কীর্ণ হইবেই, উন্মুক্ত ভাব তাহাতে অসম্ভব। প্রাণহীন দাসভাবে, আচার অনুষ্ঠানে ভালবাসা থাকিতে পারে না। সুশৃঙ্খল স্বাধীন রাজ্যেই ধর্ম্ম সম্ভব। এ সম্বন্ধে প্লেটোর মত শোভন ও সঙ্গত। ধার্ম্মিকের জীবন কেবল শান্তিপূর্ণ সুশাসিত রাষ্ট্রে ফুটিয়া উঠিতে পারে। এরূপ জীবন সকলের আদর্শরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ হয়। শ্রমবিভাগ অনুসারে প্লেটোর জাতিবিভাগ, ও কর্ম্ম অনুসারে ভারতীয় জাতি বা শ্রেণীবিভাগ একই কথা। মানসিক গঠনের উপর শ্রেণী বিভাগ, ভারতের গুণগত বিভাগের অনুরূপ। এই অংশে দার্শনিকপ্রবর যেন ভারতীয়

ভাবে অনুপ্রাণিত। দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাগুলি অনেকাংশে ভারতীয় চিন্তার অনুরূপ। ইতিহাসই কেবল সাক্ষ্য দিতে পারে কে কাহার নিকট ঋণী। আমাদের গ্রন্থের তাহা আলোচ্য বিষয় নহে। তিনি যে তিনটি জাতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ভারতের শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। সংযম প্রভৃতি গুণনির্দ্দেশও ভারতের সহিত অভিন্ন। তিনি যে Laws নামক গ্রন্থে সম্পত্তিকে ভিত্তি করিয়া চারিটি ভাগ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয়, হয় বৈশ্যকেই পৃথকরূপে বিভক্ত করিয়াছেন অথবা বৈশ্যকে শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; কারণ তিনি দাস, কৃষক, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও শিল্পী প্রভৃতিকে একই দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ধনশালীর শাসনের দোষও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অংশে মনীষী প্লেটোর বাক্য সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য। গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচনা করা আবশ্যক। গণতন্ত্রে বৈষম্যের উপর সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষে শক্তির তারতম্য আছে, শক্তির তারতম্য থাকায় সার্ব্বজনীন সাম্য অসম্ভব। উচ্ছৃঙ্খল,

উদ্দাম, অবিমৃষ্যকারী, অলস, দীর্ঘসূত্র, পরপিণ্ডলেহী এবং সংযত, দান্ত শান্ত মানবের স্বাধীনতা কখনই সমান হইতে পারে না। মূর্খের হস্তে শাসনভার অর্পিত হওয়াও সঙ্গত নহে। রাজকার্য্যে সকলের অধিকার সমান ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সকলেই সমর্থ—এই মতবাদ অতথ্যে পরিপূর্ণ। বিভিন্নতা অবশ্যই থাকিবে। বৈষম্যেই সৃষ্টি। সাম্যে লয়। বলপূর্ব্বক বৈষম্যের অভাব সংঘটন করা যায় না। জগতে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাম্য নাই। সমাজতন্ত্রবাদী সকলের ধনসম্পত্তি সমান করিয়া দিতে ইচ্ছুক। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। সকলের আবশ্যকতা সমান নহে। দরকার বুঝিয়া বণ্টন করাও সহজ নহে। প্রয়োজন ব্যক্তিগত। আজ আমার যাহা আবশ্যক কাল তাহার দ্বিগুণ আবশ্যক হইতে পারে। জনসংখ্যা সর্ব্বত্র সকল সময়ে একরূপ থাকে না। পারিবারিক জনসংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি আছে। বালক ও যুবকের আবশ্যকতারও তারতম্য বিদ্যমান। অধিকার কখনই সকলের সমান হইতে পারে না। গণতন্ত্রেও অতি গরিষ্ঠ রাজকার্য্যে সকলের অধিকার সম্ভব নহে। মূর্খ ও পণ্ডিত, বালক ও প্রবীণ সকলের অধিকার কখনও

সমান হইতে পারে না। অধিকারবোধ ব্যক্তিগত। শিশুর সে বোধ নাই। তাহার রাজকার্য্যে অধিকার আকাশকুসুমের ন্যায় কল্পনামাত্র। মূর্খ ও বাতুল প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার গ্রাহ্য হইতে পারে না। সকল গণতন্ত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোক দ্বারা পরিচালিত। ইউরোপে এবং আমেরিকায় গণতন্ত্রের তাৎপর্য্য—জমিদারদের শাসনক্ষমতা বিধ্বস্ত করা। ইউরোপে ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে জমিদারদিগের প্রাধান্য ছিল, সর্ব্ব প্রকার ক্ষমতা তাহাদের হস্তেই নিবদ্ধ ছিল। তাই গণতন্ত্রে জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে শাসন-ভার অর্পিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের ভ্রাতৃত্ব (fraternity) উদ্ভট কল্পনা মাত্র। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় cloud cuckoo-town, আমাদের ভাষায় অশ্বডিম্ব। যে স্থলে স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত অনিবার্য্য, সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনামাত্র।

দার্শনিক প্লেটোর অভিজাতের (Aristocracy) শাসন সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজনীয়। অভিজাতের শাসন শুনিলেই জমিদারদিগের শাসন মনে হয়। বংশ-

মর্য্যাদাও অবশ্যই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। জমিদারদলের শাসন আমরাও অনুমোদন করি না। কিন্তু প্লেটোর অভিজাত সম্প্রদায় দার্শনিক। এমন কি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, যাঁহারা পরমপুরুষার্থ ("The Good") লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা পরম বস্তু উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই শাসকশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য। এই অভিজাতসম্প্রদায় (Aristocracy) প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্বানের সঙ্ঘ (Intellectual aristocracy)। সকল দেশে সকল সময়েই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন ; গণতন্ত্রেও তাহাই। এরূপ অবস্থায় প্লেটোকে সাধারণ-তন্ত্রবিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। তিনি দার্শনিক আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে শাসন-ভার দিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া ইউরোপে তাঁহার মতকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ইহা নিতান্ত অশোভন। জর্ম্মন্ দার্শনিক কাণ্ট্ এজন্য Brucker প্রভৃতিকে দোষও দিয়াছেন। কিন্তু কাণ্ট্ সে স্থলে বিশেষ জোরের সহিত প্লেটোর মত সমর্থন করিতে পারেন নাই।* প্লেটো

* Kant's Critique of Pure Reason—Meiklo John's Edition 1916, pp. 222.

যখন ধনী ব্যক্তির শাসন ও Oligarchyর শাসন পছন্দ করেন নাই, তখন কেবল "লর্ড বংশের ভূতো ছেলেকে মনভুলানো খোকা" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ শিক্ষার ব্যাপারে তিনি Gymnastic কর্ম্ম, Music জ্ঞান ও Dialectic বিচার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব শাসনভার শিক্ষিত অভিজাতের উপর দেওয়া কখনই অশোভন বলা যাইতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্র মানিলে কুল ও বংশেরও তাৎপর্য্য আছে। ক্ষেত্রজ রোগ যেমন সংক্রামিত হয়, মানসিক ভাবও সেইরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে সংক্রামিত হয়।

প্লেটো যে ৫০৪০টি পরিবার নিয়া একটী রাজ্য গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহার তাৎপর্য্য সংখ্যায় নহে, শৃঙ্খলায়। কতকগুলি পরিবার লইয়া সঙ্ঘ হউক, আবার সঙ্ঘ লইয়া দল হউক, এইরূপ ভাবে রাজ্য গঠিত হইলে শৃঙ্খলা থাকিবে। ক্ষুদ্র একটী রাজ্য লইয়া বিচার করিয়াছেন বলিয়া তিনি সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী নহেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদিও তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যেই অভিজাত-তন্ত্র সম্ভব, এইরূপ মনে করিয়াছেন তথাপি তাঁহার শিক্ষা ও যুদ্ধের ব্যবস্থায় স্ত্রীলোক ও বালকদিগের

স্থান দেখিয়া মনে হয় তিনি সাম্রাজ্যেরও পক্ষপাতী; তবে আদর্শের উপর বিশেষ জোর দেওয়ায়, ইহা তত পরিস্ফুট হয় নাই। আরও একটী বিষয় ভাবিবার আছে, প্লেটো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অভিন্নরূপে দেখিয়াছেন। যেমন একটী রাষ্ট্রকে এক আদর্শে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন, সেইরূপ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্র, সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে সংবদ্ধ করিয়া ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া এক ছত্রতলে আনয়ন করিতে চাহিয়াছেন। বাহিরে দেখান (Make-believe) একতা, প্রকৃত একতা নহে। পরস্পার সংহত ও সংবদ্ধ করিবার জন্যই একটী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আদর্শরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া একটী সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারিবে, ইহাই বোধ হয় তাঁহার অভিমত। বিভিন্ন ভাবে ভাবিত বস্তুর সংযোগ সম্ভব, কিন্তু সংহনন অসম্ভব। এক আদর্শ, এক আকাঙ্ক্ষা, এক প্রাণের ভাষা, এক সংস্থান হইলে সমস্তই এক ছত্রতলে মিলিত হইতে পারিবে ইহাই তাহার অভিমত। ভারতীয় আদর্শও তাহাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত শোভন বলিয়া মনে হয় না। নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের

জন্য রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণের ন্যস্ত সম্পত্তি তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্যে ব্যবহার করিবার অধিকার না থাকাই সঙ্গত। অবশ্যই বিপদের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। বিপদ্‌কালে ন্যস্ত ধন ব্যবহার করিলেও দোষ হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি এক হওয়ার মূলে একটী প্রাকৃতিক দোষ থাকিয়া যায়। প্রত্যেকের অভাবের পরিমাণ আছে। সাধারণ বস্তু ব্যবহার হিসাবেও লোকের মানসিক তারতম্য আছে। জল, বায়ু ও আলোক সাধারণ বস্তু; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারে ইতরবিশেষ আছে। সাধারণ বস্তু ও ব্যক্তির শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন ভাব গৃহীত হয়। আবার জল, বায়ু, আলোক উৎপন্ন করিতে হয় না। ব্যয় করিলেও পুনরায় প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণ থাকে। কিন্তু সম্পত্তি পরিশ্রমের সাহায্যে উপার্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হয়। উহার ক্ষয়, ব্যয় আছে, চিরকাল পরিপূর্ণ থাকে না; প্রত্যেকের চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয়। ভূমি থাকিলেই শস্য হয় না, শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা আবশ্যক, এই পার্থক্য অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভাব থাকিবে।

তাহার পরিপূরণ হওয়া আবশ্যক। কেবল দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলে লোকের স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ব্যক্তিত্বের আবশ্যকতা আছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে অর্থ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যেমন জাতির অর্থ বৃদ্ধি দরকার, সেইরূপ ব্যক্তিরও দরকার। সাধারণের সমান অধিকার থাকিলে প্রতিভার বিকাশ হইতে পারে না। বুদ্ধিমত্তা, মিতব্যয়িতা, নিপুণতা ও সংযম প্রভৃতি গুণগুলি অর্থোপার্জ্জনে আবশ্যক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে এই গুণগুলি বিনষ্ট হয়। দুর্ব্বল ও সবল উভয়ের সমান অধিকারে দুর্ব্বল আলস্যপরায়ণ হইয়া কর্ম্মবিমুখ হয়, আর সবল ক্ষুণ্ণ মনে নিজের প্রসার না থাকায় কর্ম্মকুণ্ঠ হইয়া পড়ে। যে বিষ নিবারণের জন্য চেষ্টা, সেই বিষই সর্ব্বনাশ সাধন করে। সম্পত্তির একটী ব্যাবহারিক মূল্য আছে; আলোক প্রভৃতির ন্যায় দান বিক্রয় বা হস্তান্তর রহিত নহে। আলোক প্রভৃতির দান বিক্রয় চলে না। কিন্তু সম্পত্তি দান বিক্রয় করা চলে। বস্তুর আদান প্রদানও আবশ্যক। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য বিনিময়ের প্রয়োজন। সাধারণের ব্যবহার্য্য কতকগুলি জিনিষ রাষ্ট্রে থাকা উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত

সম্পত্তি থাকাও একান্ত আবশ্যক। কোনটিকেই বাদ দেওয়া যায় না। অবশ্যই সীমা নির্দ্দেশ কষ্টকর এবং একটী নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়াও সকল অবস্থায় সুবিধা-জনক হয় না; পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহ বিবেচনা করিয়াই সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সম্পত্তির মীমাংসা অবস্থা অনুসারে একটী নৈতিক আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অবস্থার দুই দিক্ আছে—ব্যক্তিগত ও সমাজগত। তাই একটী উচ্চ আদর্শের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই আদর্শটী ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। ভারতে রাজা প্রজাসাধারণের নিকট হইতে ষষ্ঠাংশ পাইতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তির এক গ্রাস অন্ন থাকিলে অর্দ্ধগ্রাস বুভুক্ষুকে দিবার বিধানও আছে; অতএব সম্পত্তির ব্যক্তিগত দিক্ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এ অংশে প্লেটোর মত গ্রাহ্য নহে। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার মূলেও আদর্শ থাকা দরকার। বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যাইয়া বিরোধের সৃষ্টি কখনও ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। বিরোধ পরিহারকল্পে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত নিরাস করিলাম। কিন্তু মানুষের শক্তির বৈষম্য নিরসন আবশ্যক। জোর করিয়া আইনে বাঁধিলাম,

সমাজকে অষ্টপাশবন্ধনে বাঁধিলাম। জাতি, সমাজ বিধ্বস্ত হইল; জাতীয় জীবন ধ্বংসোন্মুখ হইল; বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইলে বিপ্লব অনিবার্য্য হয়। ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশও স্বাভাবিক নিয়ম। ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের সামঞ্জস্যই প্রকৃত স্বভাবজ ধর্ম্ম। প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টিই শরীর পুষ্টির নিদর্শন। ইহার বিপর্য্যয় জীবন নহে; ইহাকে মৃত্যুও বলা যাইতে পারে না; কারণ মৃত্যুতেও একটি স্বাভাবিকতা আছে। ইহা এক প্রকার জড়ত্ব (dull inanition)।

প্লেটো আইন প্রণয়নের ভার দার্শনিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। দার্শনিকই আইন প্রণয়নের উপযুক্ত। দার্শনিক ভিত্তিতে নিয়ম প্রণীত না হইলে সে নিয়মে ব্যক্তির ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয় না। নিয়মে উদারতা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত, কুলগত ও জাতিগত ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহিত রাষ্ট্রীয় বিকাশের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আইন প্রণয়ন যুক্তি সঙ্গত এবং তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত। আইনকে বিধিপালনরূপে গ্রহণ

করিলে তাহা প্রাণের জিনিষ হয়। ভারতে তাই ব্যবস্থাতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট। ব্যবস্থা পালন ধর্ম্ম, উহাতে কর্ত্তব্যবোধ ও প্রাণের আকর্ষণ থাকে।

কিন্তু আইন প্রয়োগ বা ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা প্লেটোর মতের অনুমোদন করিতে পারি না। আইন যথাসম্ভব প্রয়োগ না করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা সার্ব্বভৌম হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—উভয়ই ধর্ম্ম ; যাঁহারা কেবল পালনটুকু বুঝেন তাঁহারা একদেশদর্শী। রুদ্রভাবও ভগবদ্ভাব ; শাসনেও মঙ্গল নিহিত ; ধ্বংসও সৃষ্টির ক্রম। শাসনের তাই আবশ্যকতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসা তামসিকতা ; উহা ভালবাসা নহে, পক্ষান্তরে শত্রুতা ; অসুরভাব ও দেব-ভাব সংসারে অবশ্যম্ভাবী। দেবভাবের বৃদ্ধিকল্পে অসুরভাবের গতিরোধ করা ধর্ম্ম। অহিংসাও ধর্ম্ম, বৈধ হিংসাও ধর্ম্ম। যাঁহারা সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলিয়া অহিংসার ব্যবস্থা দেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এক-দেশদর্শী। তাঁহাদের কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। আইন প্রণয়নে বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। উহার প্রয়োগ ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন,

কিন্তু প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ হইতে পারে না; বরং আইনগুলি সুসংযত ও সরল এবং সহজ ও উদার হওয়া আবশ্যক। প্রাণের জিনিষ না হইলে সে আইন শৃঙ্খল, সে শৃঙ্খলে আইন কর্ত্তারও বিকাশ নিরুদ্ধ হয়, আর যাহারা নিগড়িত তাহাদের বিনাশ অনিবার্য্য। প্রয়োগকারীরও মানসিক ও শারীরিক বিপর্য্যয় হয়, এবং যাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয় তাহারাও বিপর্য্যস্ত হয়। আইনের আবশ্যকতা আছে, প্রয়োগেরও আবশ্যকতা আছে। তবে প্রয়োগেও উচ্চতম আদর্শ থাকা প্রয়োজন। শাসনের তাৎপর্য্য শুদ্ধিতে। উহা প্রতিহিংসা দ্বারা পরিচালিত হওয়া অনুচিত। প্রতিহিংসা (Vindictiveness) ধর্ম্ম নহে; উহা পরিপূর্ণ অধর্ম্ম। পাপের ফল প্রদান (Retribution) করিবার উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদানও সঙ্গত নহে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিচারবিভ্রাটে নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দণ্ডিত হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে পাপের শাস্তি বা অপরাধীর শাস্তি হইল, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিচার প্রহসন মানবীয় ঘটনা। বিচারকর্ত্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী নহে, এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী না হইলে নির্দ্দোষ বিচার অসম্ভব। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি সকল দিক বিবেচনা করিয়া

বিচার করা মানবের সাধ্যাতীত। বাহিরের বিচার অবশ্য বাহির দেখিয়াই করা হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং কার্য্যফলের গুরুত্ব ও লঘুত্ব দেখিয়া শাস্তি বিহিত হয়। একটী গতির পরিণতি (Resultant) লক্ষ্য করিয়া শাস্তি প্রদত্ত হয়। কিন্তু গতির মূল সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পাপের ফল প্রদান করা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষেই সম্ভব, কারণ তিনি ভাবগ্রাহী। শাসন শোষণ নহে, শাসন মঙ্গলের নিদান। অতএব শুদ্ধির (Correction) জন্যই শাস্তি প্রদত্ত হওয়া উচিত। এইরূপ ভাবে আইনের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত এবং ইহাই আইন প্রয়োগের আদর্শ। সুতরাং আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে প্লেটোর মত অবিসংবাদিত রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

প্লেটো একটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সেই বিষয়টী উল্লেখ করিবার লোভ এস্থলে সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি রিপাব্লিক নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"In whatever city those who are to govern, are the most averse to undertake government, that city, of necessity, will

ট

be the best established and the most free from sedition" অর্থাৎ যাহারা শাসনভার নিতে অনিচ্ছুক বা লালায়িত নহে তাহাদের হস্তে শাসনভার প্রদান করিলে রাজদ্রোহ প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না। যাহারা শাসনভার নিতে লালায়িত তাহারা অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী হয়। যাহাদের ইচ্ছা প্রবল, বাসনা যাহাদের অতৃপ্ত, যাহারা কামনার বশে উদ্দাম, তাহারা সর্ব্বদাই ক্ষমতাপ্রিয় হয়। ক্ষমতাপ্রিয়তার ফলে মানুষ অত্যাচারী হইয়া পড়ে। যাহারা কর্ত্তব্যবোধে রাজ-কার্য্য করিয়া যায়, তাহাদের অন্তরে অভিমানের বীজ থাকে না। যাহাদের দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, পারুষ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহারা শাসন করিতে গিয়াও অত্যাচারী হয় না। অত্যাচার প্রভৃতির ফলেই রাজ-দ্রোহাদির উদ্ভব হয়। অত্যাচার নিবারণকল্পে ভারতের ব্যবস্থা আরও মনোজ্ঞ। ভগবানের প্রীতির জন্য রাজ্য-শাসন ও ভগবদুদ্দেশ্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা বিহিত হউক, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ প্রীত হউন—ইহাই ভারতীয় ব্যবস্থা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদলসা তাঁহার পুত্র অলর্ককে এই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠে চূড়ালা ঐ ভাবের প্রেরণায় রাজকার্য্য পরিচালনায় তৎপর

স্বামীকে তদ্ভাবে ভাবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। রাজর্ষি জনক, মান্ধাতা, শিবি, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শাসনের মূলে ঐ ভাবই নিহিত। মহাভারতে বন-পর্ব্বে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন,—

"নাহং কর্ম্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত॥

অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥

ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্মফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥

ধর্ম্মএব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ব্রহ্মবাদিনাম্॥"

অর্থাৎ হে রাজপুত্রি! আমি ফলাকাঙ্ক্ষী নহি। দাতব্য বুদ্ধিতে দান করি এবং যষ্টব্য বুদ্ধিতে যজ্ঞ সম্পাদন করি। ফল হউক বা না হউক পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, গৃহে বসিয়াই হউক অথবা অন্যত্রই হউক যথাশক্তি সেই কর্ত্তব্য আমি সম্পাদন করি। হে সুশ্রোণি। আমি ধর্ম্মফলের জন্য ধর্ম্ম আচরণ করি না। শাস্ত্র অতিক্রম ও সাধু ব্যক্তিদিগের আচরণের অবমাননাও করি না।

রাজনীতি।

আমার মন স্বভাবতঃই ধর্ম্মেতে নিবিষ্ট। ব্রহ্মবাদিগণের নিন্দিত ধর্ম্মবাণিজ্য আমার নাই। যাহারা ব্যাকুল ও লোলুপ তাহারা দুর্য্যোধনের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট। তাহারা ভারতীয় শাস্ত্রে নিকৃষ্ট বলিয়া অবধারিত।

লোককে তাড়না করা যাহাদের ব্যবসা, যাহারা উহার জন্য লালায়িত, তাহারা শাসনভার পাইলে অনর্থের সৃষ্টি করে। যাহারা শাসনের দায়িত্ব বুঝিতে পারে, তাহারা শাসনভার গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয় না। ক্ষমতার জন্য ব্যাকুল হওয়া দুর্ব্বলতার নিদর্শন। যাহারা শাসনের দায়িত্ব বুঝিতে পারে তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। সাত্ত্বিক ব্যক্তির অভিমান নাই। তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান বিরহিত, পরন্তু ধৈর্য্যশীল ও উৎসাহ-পরায়ণ। বিপদে তিনি মুহ্যমান হন না। তিনি স্থির, ধীর। কিন্তু যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসিবার জন্য হস্ত রক্তে কলঙ্কিত করে তাহার সন্দেহ কখনই নিরস্ত হয় না। সন্দেহের বশে সে সর্ব্বদাই নিজের প্রাণভয়ে ব্যস্ত থাকে। এই শ্রেণীর লোক অত্যাচারী অবশ্যই হইবে। সাত্ত্বিকভাব বাদ দিলেও যাহারা শুধু শাসন করিবার জন্য লালায়িত, তাহাদের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত

করা অতীব অসমীচীন। তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মজ্ঞান থাকে না।

মোটের উপর প্লেটোর মতের আলোচনা করিতে গিয়া ভারতীয় ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। সর্ব্বাংশে ঐক্য না থাকিলেও তাঁহার মত ভারতীয় মতের অনুরূপ এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মত আদরের জিনিষ। ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাঁহার মত অনু-বর্ত্তন করিবার যোগ্য।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় মত অনেক পরিমাণে এরিষ্টটলের মতের উপরে বিন্যস্ত। সুতরাং তাঁহার মতের আলোচনা করা আবশ্যক। যদিও জর্ম্মন্ দেশে ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের সময় রাষ্ট্রীয় দর্শনের অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল, তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এরিষ্টটলের ভাব ইউরোপের শাসনযন্ত্রে অল্পাধিক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত।

এরিষ্টটলের মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—প্লেটোর ন্যায় এরিষ্টটলও স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নৈতিক আদর্শের পূর্ণতা রাষ্ট্রেই সম্ভব এবং মানুষ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। কারণ, মানুষ দেবতা নহে। মানুষ মানুষই। সমাজ-শৃঙ্খলার

বহিরবস্থিত মানুষ হিংসাপরায়ণ নরপশুতে পরিণত হয়। তাঁহার নীতি-বিজ্ঞানের (Ethics) প্রয়োগ-প্রণালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নীতি-বিজ্ঞানের প্রণালীগুলি রাষ্ট্রীয় সমস্যাতে প্রযোজিত। ইহাই তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধ। রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে তিনি নানা প্রকারের রাষ্ট্রীয় প্রণালীর বিচার করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য—কোন্ প্রণালীতে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ হইবে। তিনি পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বাদ দিয়া থাকিতে পারে না। পরিবারের আস্‌বাব্ আবশ্যক। আস্‌বাব্ ব্যতীত পরিবারের কার্য্যাদি চলিতে পারে না। পরিবারে ভৃত্য বা গোলামের দরকার। তাহাদের প্রাপ্য দিতে হইবে। কারণ, তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা নাই। তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর অধীন। তিনিও প্লেটোর ন্যায় হেলেন্‌বাসীদিগের দাসত্বের বিরোধী। অন্য দেশের লোককে গোলামরূপে গ্রহণ করায় তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করাকে তিনি বর্ব্বরোচিত প্রথা বলিয়া মনে করেন। পরিবারে সন্তান আবশ্যক। পরিবারে যেরূপ কর্ত্তা

অত্যাচারী হইতে পারে, রাজ্যেও সেরূপ রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারে এবং পরিবারের কর্তার ন্যায় রাজা সাধারণতন্ত্রবাদীও হইতে পারে। পরিবারে স্ত্রী, সন্তান ও ভৃত্য প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার উভয় প্রকারই হইতে পারে। পরিবারের আয় আবশ্যক। আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিয়া সংসার চালাইতে হয়। আয়ের ভিতরে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পীর বেতনের আয়। কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েই শ্রমজীবীর বেতন দিতে হয়। দাসগণের শাসন, সন্তানের শিক্ষা এবং স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ সংসার পরিচালনের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটী পরিবার নিয়া গ্রাম্য সমিতি (Village commune) এবং কতিপয় গ্রাম্য সমিতি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। মানবের স্বাভাবিক লক্ষ্যই রাষ্ট্রীয় শাসন। মানুষের বাক্‌শক্তি সংযত হইয়া যেরূপ তাহার উপকারী হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় শাসনও মানুষের উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া কল্যাণ সাধন করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে আবশ্যকতা বোধ আছে, কিন্তু কেবল আবশ্যকতাই ইহার মূল নহে; কারণ, তাহা হইলে পশু প্রভৃতিও রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারিত। ইহা কেবল পরস্পর আক্রমণ ও প্রতিরোধের জন্য সম্মিলনের (Offensive

and defensive alliance) ন্যায় একটী হাতগড়া প্রণালীও নহে। ইহার লক্ষ্য ও মন্ত্র—সুখী, শান্ত ও পবিত্র জীবন। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র পরিবার ও গ্রাম্য সমিতির আশ্রয়। সম্পূর্ণ বস্তু খণ্ডিত বস্তুর সমষ্টি। সম্পূর্ণ বস্তু সর্ব্বত্রই অংশের আশ্রয়। পূর্ণ বস্তুতেই অংশগুলির প্রতিষ্ঠা।

তিনি প্লেটোর রাষ্ট্রীয় মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্লেটোর রাষ্ট্রে প্রত্যেক অংশের স্বাধীন ভাব পরিস্ফুট হয় নাই এবং প্লেটো সমষ্টির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা নিষেধ করায় মানুষের কতকগুলি গুণ বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

রাজ্য প্রজাগণের (Citizens) শরীর। প্রজা দাস নহে, প্রজার হুকুম মানা ও হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। মঙ্গল প্রজাগণের লক্ষ্য এবং তাহাদের বিচার ও পরামর্শ প্রদানের অধিকার আছে। দাস ও প্রজার মাঝামাঝি স্থান কর্ম্মচারীবর্গের। ইহারা সাধারণের বেতনভুক্ চাকর। যাহাতে প্রজাবর্গের (Citizens) মঙ্গল সাধিত হয় এবং আইনের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, তাঁহার মতে সেইটীই প্রকৃত শাসনতন্ত্র। মঙ্গল সাধন

ও আইনের ব্যবস্থা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও অভিজাতন্ত্রেও সম্ভব। দোষগুণ সকলতন্ত্রেই সম্ভব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই বিচ্যুতি অনিবার্য্য। সমষ্টির মঙ্গল না চাহিয়া কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাহিলেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র শক্তিশূন্য হয়। তাঁহার মতে যদি কোনও রাজা দেবতুল্য গুণশালী ও বীর্য্যবান্ হন, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাই সমীচীন পন্থা। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মতে উন্মত্ত বা উদ্ভ্রান্ত হইয়া রাজাকে একঘরে করা পাপ। এই মত তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিয়াছেন।

রাজ্যের প্রধান কর্ত্তব্য মন্ত্রনা, বিচার, যুদ্ধ ও সন্ধি-স্থাপন। এই সকল বিষয় যে ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মতে স্থিরীকৃত হয় তাহা রাজতন্ত্র (Monarchy) ; ধনে ও বংশে শ্রেষ্ঠ কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা যে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হয় তাহা অভিজাত-তন্ত্র (Aristocracy) নামে অভিহিত ; জনগণের দ্বারা সম্পাদিত শাসন গণতন্ত্র (Democracy) বলিয়া কথিত। রাজতন্ত্রের বিষময় ফল যথেচ্ছাচার ; অভিজাত-তন্ত্রের বিষময় ফল oligarchy (সম্প্রদায় বিশেষের শাসন) এবং polity বা প্রজাবর্গের শাসনে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা mob-rule এতে পরিণতি লাভ করে। বিপ্লব

নিবারণ সম্বন্ধে তিনি রাজশাসনের ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিপ্লবের কারণও অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি oligarchy ও গণতান্ত্রিক শাসনের (democracy) প্রকার-ভেদ ও স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের নিয়ম উলঙ্ঘন করার মত গুরুতর অপরাধ অন্য কিছুই হইতে পারে না—"There are no worse crimes than those against the constitution of the state."

যদি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম এক বা অভিন্ন হয় তাহা হইলে সে পূর্ণ সুখ লাভ করিতে পারে। ইহার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকূলতা আবশ্যক। অনুকূল অবস্থাগুলি ভূমির একরূপতা, সমুদ্রের সান্নিধ্য, সমানুপাতিক জনসংখ্যা (অর্থাৎ ঘন বসতিও নহে বিরল প্রজাও নহে), জনসমূহের বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি। এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ম বা আইন দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। সত্ত্ব সাব্যস্তের আইন থাকা একান্ত উচিত। ব্যক্তিগত বা সাধারণের ব্যবহার্য্য ভূমি থাকা প্রয়োজন। দাসেরা ভূমি কর্ষণাদি করিবে। প্রজাবর্গের বিশ্রাম সুখ আবশ্যক। যুবকদলের

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, তাহারাই ভবিষ্যৎ প্রজা (Citizen)। বিবাহ সম্বন্ধে আইন থাকিবে। কোন কোনও প্রকারের বিবাহ নিষিদ্ধ থাকিবে। শিক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ আইন থাকা প্রয়োজন। বিবাহ অপেক্ষা শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ থাকা আবশ্যক। অষ্টম বর্ষ হইতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে। প্রথমেই শারীরিক শিক্ষা (Gymnastics)। ইহার ফলে প্রজা সবল ও সংযমী হইবে। তৎপরে music বা জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বোপরি ন্যায়পরায়ণ ও মিতাচারী হওয়া প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস আবশ্যক। Theoretical জ্ঞান শান্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু মিতাচার ও ন্যায়পরায়ণতা সর্ব্বক্ষেত্রেই আবশ্যক। প্রত্যেক প্রজাই বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে বাধ্য এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যবস্থাতত্ত্বের পোষক ও পালক। অতএব পৃথক্‌ভাবে যোদ্ধৃজাতি থাকিবার আবশ্যকতা নাই। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপরই শাসনযন্ত্র নির্ভর করে অর্থাৎ জাতীয় বিভিন্নতার জন্য শাসনযন্ত্রও বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্লেটো ও এরিষ্টটলের পার্থক্য শুধু আভিজাত্যের বিচারে। প্লেটো আভিজাত্যের পক্ষপাতী, এরিষ্টটল্ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে অধিক পরিমাণে

ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক। রাজতন্ত্র সম্বন্ধেও মতের বৈপরীত্য আছে। প্লেটো বহু লোক সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইতে পারে স্বীকার করিয়া তাহাদেরই শাসনাধিকার অনুমোদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এরিষ্টটল্ একব্যক্তিতেই গুণ-সম্পন্নতা সর্ব্বাধিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাজশাসনকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি দ্বারা সংযত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কোন কোন স্থলে তিনি গণতন্ত্রের (Democracy) এবং oligarchyর মাঝামাঝি শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাই এরিষ্টটলের রাষ্ট্রীয় দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এরিষ্টটলের মতের সমালোচনা—এরিষ্ট-টল্ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের স্বাভাবিকতাই স্বীকার করেন। চুক্তিবাদ তাঁহার মতে স্থান পায় নাই। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, পরিবারে যাহা সত্য, রাজ্যের পক্ষেও তাহাই সত্য, এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করায় রাষ্ট্রীয় যন্ত্র স্বাভাবিক বিকাশের ফল—এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে; ইহা সুচারু ও সমীচীন। তিনি রাজতন্ত্রের বিরোধী নহেন, কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দ্বারা রাজশক্তি খর্ব্ব করিবার পক্ষপাতী। তিনি প্লেটোর অভিজাত-বাদের পরিবর্ত্তে মধ্যবিত্তের অধিকার-প্রাধান্য ব্যবস্থা

করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। শাসনাধিকারের যোগ্যতা ঐশ্বর্য্যের উপর ন্যস্ত রাখা অতীব অসমীচীন। প্লেটোর অভিজাত সম্প্রদায়কে বিদ্বানের সঙ্ঘরূপে গ্রহণ করিলে, অভিজাত শাসন দোষাবহ বলা যাইতে পারে না; কারণ, বিদ্বানের—দার্শনিকের শাসন সর্ব্বানুমোদিত। ভারতেও বিদ্বানের শাসনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। রাষ্ট্র পরিচালনে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী; ক্ষত্রিয়গণও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়াই ভারতে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। আমাদের মনে হয়, প্লেটো ও এরিষ্টটলের মিলনই বাঞ্ছনীয়। ক্ষত্রিয় অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, ধনশালী, প্রজ্ঞাবান্ ও উচ্চবংশোদ্ভব। তাহার সহিত মধ্যবিত্ত জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সহযোগই প্রকৃত পন্থা। ধন ঐশ্বর্য্য ব্যবসায়ীর হস্তে পতিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীর শাসন (Plutocracy) শোভন নহে। দোকানদার হিসাব বুঝে, মানুষ গড়িতে জানে না। রাষ্ট্রের নৈতিক আদর্শ সে বুঝিতে পারে না। অভিজাত বলিতে ধনশালীকে বুঝায় না, বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইবে। প্লেটো ও এরিষ্টটল্ উভয়েই দাসের স্থান অতি নিম্নে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। Slave বা গোলাম প্রজাধিকার পাইতে পারে না। তাহারা কেবল প্রভুর সুখ বিধানের জন্য সৃষ্ট। ইহা অমানুষিক ও অশোভন। এই প্রকার অমানুষিক ভাবের উপরেই রোমের প্রজাগণের দম্ভ ও দর্পের ভিত্তি। ইহার ফলেই ইউরোপীয়দের বিদেশীর প্রতি ঘৃণা। ইহার ফলেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌গণ ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিতাড়িত। ভারতে শূদ্র slave বা গোলাম নহে, তাহারও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে। বিদুর মন্ত্রী ছিলেন, সুমন্ত্র সারথি হইয়াও মন্ত্রী। ভারতীয় শূদ্রের অবস্থার তুলনায় গ্রীক্ দার্শনিকদিগের দাসগণের অবস্থা "আস্‌-মান্ জমীন তফাৎ"। গ্রীক্‌গণের দাস যন্ত্রমাত্র। ভারতে শূদ্র মানুষ—বিরাট পুরুষের অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় অধিকারে শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমান। Citizen ব্রাহ্মণও, শূদ্রও। কেবল ব্যবহারতত্ত্বে শূদ্রের প্রতি কঠোরতা দেখিতে পাই।

ভারতীয় ব্যবস্থাতত্ত্বের এই বিধান অবশ্যই আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বিধানে শূদ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কঠোরতা অধিকতর দেখিয়া মনে হয়, কেবল শূদ্রের তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এইরূপ বিধান বিহিত হইয়াছিল। মূল বিধান

দেখিলে এই অবস্থা কেবল তাৎকালিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ, যে ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তির এক কার্ষাপণ মাত্র দণ্ড, সেই ক্ষেত্রে রাজার দণ্ড সহস্রগুণ। শূদ্রের অত্যাচার নিবারণ কল্পে ঐরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সভ্যদেশেও বর্ত্তমানে অপরাধ-প্রবণ জাতিসম্বন্ধীয় আইন (Criminal Tribes Act) প্রণীত ও প্রযুক্ত হয়। আমেরিকার Lynch Law বা বিনা বিচারে দণ্ড ভারতীয় বিধান হইতে নিকৃষ্ট। আমাদের মনে হয়, ইহা অত্যাচার ও অবিচার। ইহাকে নৃশংসতা বলিলেও দোষাবহ হইতে পারে না। গ্রীক্ দার্শনিকগণের দাস সম্বন্ধীয় মতবাদ একেবারেই সমর্থন করা যায় না।

এরিষ্টটল্ প্লেটোর সমষ্টিবাদ বা সমিতিবাদ (অর্থাৎ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার নাই) নিরসন করিয়াছেন। আমরাও প্লেটোর মতের সমর্থক নহি। পূর্ব্বেই আমরা প্লেটোর সমালোচনায় তাহা দেখাইয়াছি।

এরিষ্টটল্‌কে গণতন্ত্রের সমর্থকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার গণতন্ত্র রাজতন্ত্র হইতে পৃথক্ নহে, রাজা প্রজার সম্মতি ও অনুমোদন অনুসারে কার্য্য করিলেই হইল। আমরাও এরূপ রাজতন্ত্র বা

গণতন্ত্রের সমর্থক। রাজতন্ত্রের শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইলে, প্রজার সুখ রাজার সুখ বলিয়া গৃহীত হইলে, উহাকে গণতন্ত্রও বলা যাইতে পারে। এইরূপ রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের সুবিধা এই যে, তাহাতে শক্তি ঐককেন্দ্রিক হয়। শক্তি কেন্দ্রচ্যুত হইলে জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য হয়। শক্তি কেন্দ্রে সংবদ্ধ না হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময়ে নানারূপ অসুবিধার উদ্ভব হয়। শাসনযন্ত্র যত কেন্দ্রীভূত হয়, বহিরাক্রমণ রোধ করিবার শক্তি ততই অধিক হয়। এরিষ্টটলের এই মতের সহিত ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। তিনি গুণশালী রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের "বাতিক" অতীব হেয় বলিয়া তাঁহার নিকট পরিগৃহীত। কর্ম্মচারিগণের যে স্থান তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ ও সুশোভন। প্রজার নিম্নে রাজকর্ম্মচারীর স্থান—ইহা সর্ব্বানুমোদিত। আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) দেশের সর্ব্বনাশ করে ; ভারতে তাই কর্ম্মচারীদিগের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা। কর্ম্মচারীর পেষণে প্রজাশক্তির বৃদ্ধি অসম্ভব। এমন কি প্রজার ব্যক্তিগত বিকাশও রুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রীয় অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করা অপরাধ—ইহা শোভন।

ভারতে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে রাষ্ট্রীয় শাসন স্থাপিত। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের শৃঙ্খলা নষ্ট করাও পাপ। এ ক্ষেত্রে দার্শনিকপ্রবরের মত ভারতীয় আদর্শের অনুরূপ।

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ধর্ম্ম এক বা অভিন্ন, এই মতবাদ অতীব শোভন। বস্তুতঃ স্বাধীন ও ধর্ম্ম-রাজ্যেই ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্বের বিকাশ সম্ভব। রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সহায়। রাষ্ট্রের অব্যাহত গতিতে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ সাধিত হয়। রাষ্ট্রের আদর্শও ধর্ম্ম। প্রজার ধর্ম্ম ও আদর্শ হইতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম ও আদর্শ ভিন্ন হইলে প্রজাশক্তি ধ্বংসোন্মুখ হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সমষ্টির ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন হইলেই সাগর-সঙ্গমরূপ মহাতীর্থের উৎপত্তি হয়।

বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা ও নিয়ম নির্দ্দেশ সমীচীন। সমাজের জন্য ধর্ম্ম ও সন্তান আবশ্যক। বিবাহের পবিত্রতার উপর উভয়ই নির্ভর করে। শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক—ইহাও শোভন। মনু অষ্টমবর্ষ বিদ্যারম্ভের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বালক পঞ্চম বা অষ্টমবর্ষে উপনীত হইবে। এরিষ্টটলও অষ্টমবর্ষ বিদ্যারম্ভের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিক্ষা রাষ্ট্রীয় শাসনাধীনে থাকিবে। ভারতীয় বিধানে

রাজা প্রত্যেককে শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষাসূত্র নির্দ্ধারণ ব্রাহ্মণের অর্থাৎ প্রজার হস্তে থাকিবে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র অর্থ দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হস্তে নিয়োজিত থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে শিক্ষার স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে এরিষ্টটলের মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

তিনি যোদ্ধৃজাতি সৃষ্টির বিরোধী। তিনি সকলকে রাজ্যরক্ষা কার্য্যে নিয়োগ করিতে বিধি দিয়াছেন। প্লেটো সামরিক জাতি সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় বিশেষভাবে সামরিক জাতি থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ সকলেরই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করা শোভন; কিন্তু বিশেষভাবে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকা আবশ্যক, যাহারা প্রকৃতি অনুসারেই সামরিক ভাবাপন্ন। প্রত্যেক মানুষের সমরস্পৃহা সমান নহে। দুর্ব্বল ও ভীরু স্বভাবাপন্ন লোকও আছে। বীরত্ব ও ধীরত্ব অনেক পরিমাণে স্বভাব ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সকলে বীরজনোচিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে কৃষি বাণিজ্যাদির ক্ষতি

অনিবার্য্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারাও প্রবহমান থাকিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির জন্য কৃষি বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানাদি একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ অবস্থায় সকলের পক্ষে যুদ্ধ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও শুধু সামরিক কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে একদল লোক গঠিত থাকা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকেরই আপন স্বভাবের স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। সামরিক ভাব (Military spirit) সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকে না—সামরিক স্বভাব বিশেষভাবে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষে থাকে। এই বিশেষত্বের স্ফুরণও প্রাকৃতিক নিয়ম। এইরূপ বিশেষত্বের গতিরোধে প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভার অভাবে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষাত্রশক্তির উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খলভাব অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে; কিন্তু সামরিক সম্প্রদায়গঠন বিশেষ প্রয়োজনীয়। একনিষ্ঠার মূল্য সমধিক। যে ব্যক্তি বহু বিষয়ে মনঃসংযোগ করে তাহার পক্ষে পারদর্শিতা লাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্যও সামরিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়া উচিত। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই স্ফূর্ত্তি হয়। কেরাণীর সৃষ্টি অপেক্ষা সৈন্যের সৃষ্টি জাতীয় জীবনে অধিকতর

প্রয়োজনীয়। মন্ত্রীর আবশ্যকতা হইতে সেনাপতির আবশ্যকতা কম নহে। একনিষ্ঠ না হইলে সমরনিপুণতা লাভ হয় না। অস্ত্রবিদ্যা বা সমরবিদ্যাও একটী শিক্ষণীয় বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমরা প্লেটোর অনুসরণ করিব; পরন্তু সকলকে অল্পাধিক পরিমাণে সমরবিদ্যায় শিক্ষিত করা আবশ্যক—এরিষ্টটলের এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিব। ভারতে ক্ষত্রিয় সামরিক জাতি হইলেও ব্রাহ্মণগণকে সমরশিক্ষক রূপে দেখিতে পাই। মহারাষ্ট্র জাতির ভিতর চণ্ডালও সেনাপতিত্ব করিয়াছে। মহাভারতে একলব্যের অস্ত্রশিক্ষার ইতিহাস সর্ব্বজন-বিদিত। স্ত্রীলোকগণকেও রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। জনা প্রভৃতির উপাখ্যানও বর্ণিত আছে। রাজপুত ইতিহাস রমণীর বীরত্ব-কাহিনীতে পূর্ণ। মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের অঙ্গরক্ষীরূপে শস্ত্রধারিণী ললনা নিয়োজিত ছিল। ভারতে অন্যান্য জাতির সমরশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই উপজীবিকা ছিল।

প্লেটো আদর্শবাদী (Idealist); কিন্তু এরিষ্টটল্ আদর্শ ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমধিক ইচ্ছুক ছিলেন। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

এরিষ্টটলের একটী বিষয় আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন ও বরণ করি। তাঁহার মতে জাতীয় প্রকৃতির উপাদান অনুসারে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র উদ্ভূত হইবে। বাস্তবিক জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ রাষ্ট্র আবশ্যক। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রে অবশ্যই অনুপ্রবিষ্ট হইবে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র "তৈয়ারী করা" বস্তু নহে; উহা জান্তব প্রকৃতির ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়াই জাতীয় শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে। ফরাসীর ঢাকে জর্ম্মণীর গঁদ্ বাজে না। ইহার সার্থকতা আছে। প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকিবেই। যে দেশে ধর্ম্মের মহিমা উদ্‌ঘোষিত, সে দেশে ধর্ম্মই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ভিত্তি হইবে। যে স্থলে ধর্ম্ম গৌণ, সে স্থলে ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপকরণ স্থানীয় হইয়া পড়িবে। ভারতে ধর্ম্ম রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে ধর্ম্ম রাষ্ট্রের অধীন, এই প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অনিবার্য্য। এই প্রাকৃতিক বিভিন্নতার জন্য শাসন-শৃঙ্খলাও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। যে দেশে শাসন-যন্ত্র যেরূপ সহজ ভাবে আবির্ভূত, সে দেশের পক্ষে তাহাই শোভন। অন্যরূপ শাসন প্রবর্ত্তন করিলে তাহাতে জাতীয় জীবন সমুন্নত হইতে পারে না।

প্রাণের গতি যেরূপ অব্যাহত হওয়া আবশ্যক, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের গতিও সেরূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রতিকূলতায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয়। প্রতিকূল ভাবে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র গঠিত হইলে জাতীয় জীবন ধ্বংসোন্মুখ হয়।

গ্রীক্ দার্শনিকদ্বয়ের মত আলোচনা করিতে গিয়া ভারতীয় চিন্তার সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইলাম। ভারতীয় মতের সাদৃশ্য গ্রীক্ চিন্তায় সুস্পষ্ট। প্লেটো ও এরিষ্টটল্ উভয় মনীষীর মতের সম্মিলন বাঞ্ছনীয়। যাঁহার যে অংশ পরিত্যাজ্য ও যে অংশ গ্রহণীয় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তার স্বাভাবিকতার প্রতিধ্বনি গ্রীক্ ও জর্ম্মণ চিন্তায় দেখা গেল। কারণ হেগেলও স্বভাববাদী। ভারতীয় মহাপ্রাণতার চিহ্ন অগষ্ট কোম্‌তের মতেও দেখিতে পাইয়াছি। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র গঠন করা অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রীয় আদর্শ দার্শনিক ও পরিচালন-শক্তি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নিয়ম প্রণয়নাদিতেও দার্শনিকতার প্রয়োজন। কারণ, উহার মূলেও আদর্শ থাকা প্রয়োজন। দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র স্থাপিত, সেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রই জাতীয় জীবনের বিকাশ সাধনে সমর্থ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিন্তার

তুলনায় এই মহান্ সত্যটী সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। এই স্বাভাবিকতা পরিত্যাগ করিলেই সহস্র প্রকার চুক্তির আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। চুক্তিবাদের বিষময় ফলে সামাজিক জীবন কলুষিত হয়।

আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ভারতীয় মতের আভাষ প্রদান করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ইউরোপীয় মতের দোষগুণ বিচার ও ভারতীয় মতের সহিত তুলনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভারতীয় মতের বিকাশের ধারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের মনে হয় এরূপ তুলনামূলক দার্শনিক প্রবন্ধের আলোচনায় আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় মতের বিশেষত্ব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজশক্তিই ভগবচ্ছক্তি বা জনসাধারণের শক্তি। প্রজাশক্তি বা ভগবচ্ছক্তিই প্রকৃতপক্ষে রাজার শক্তি। জাতীয় চরিত্র গঠনে ভগবদ্ ভাবের উন্মেষই বাঞ্ছনীয়। শাসনের তাৎপর্য্য স্বাভাবিক ভাবে চরিত্রের বিকাশ। সামাজিক শাসনও এই জন্যই প্রয়োজনীয়। ভারতে রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম রক্ষা ও তাহাদিগকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা। প্রত্যেককে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা রাজকীয় কর্ত্তব্য। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থাপন রাজার কর্ত্তব্য। মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাই—

"স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থানাং বর্ণানাং পৃথিবীপতেঃ।
পরোধর্ম্মঃ সদা প্রোক্ত স্তত্র যত্নোপরো ভবেৎ॥
স্বধর্ম্মপ্রচ্যুতান্ রাজা স্বে ধর্ম্মে বিনিযোজয়েৎ॥"

মনু ও বিষ্ণুস্মৃতিতে বর্ণাশ্রমরক্ষা রাজধর্ম্মরূপে উল্লিখিত আছে। প্রজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাজ্যের

শৃঙ্খলা থাকে না। কর্ত্তব্যবোধের দৃঢ়তা না থাকিলে যত আইনই প্রণীত হউক না কেন, অনাচার নিবারিত হইবে না। জাতি ধর্ম্ম-গত-প্রাণ হইলেই জাতীয় অনাচার বিদূরিত হয়। রাজা যেমন প্রজাগণকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন, তেমন নিজেও স্বধর্ম্ম পালন করিবেন। যজ্ঞ দান প্রভৃতি ক্রিয়া রাজার অনুষ্ঠেয়। গার্হস্থ্যোচিত কার্য্য রাজার করণীয়। উপাসনা, পূজা, ধ্যান তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। প্রজার হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার প্রচেষ্টায় রাজা ও প্রজার সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা পিতা বা পিতৃতুল্য। ভয়ত্রাতারূপে রাজা পিতৃস্থানীয়। এই সম্বন্ধবলে রাজা ও প্রজা পরস্পরের সহায়রূপে রাষ্ট্রীয়যন্ত্র পরিচালন করিতেন। যে ক্ষেত্রে রাজা অত্যাচারী ও অধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই রাজার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। ভারতে রাজধর্ম্মের যে ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ভারতের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূলতায় প্রবহমান ছিল। মূল উৎসের প্রবাহ জাতীয় জীবনধারার প্রচার ও প্রসার বিধান করিয়াছে। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রতিপালক; তিনি নিজে ধর্ম্মানুষ্ঠান-

কারী। রাজর্ষি জনক প্রভৃতি রাজার আদর্শ। বিচারে সমতা রক্ষা করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। "নাদণ্ড্যো-নাম রাজ্ঞোঽস্তি" ইহাই রাজার বিচারের মূলসূত্র। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের সম্মান ও দুষ্টের শাসনে রাজার ধর্ম্ম পালিত হইত। বিচার বিভাগ আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বিচারে প্রহসন না হয়, তদ্বিষয়ে রাজা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। "অদ-ণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা" নরক ভোগ করিতেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তি যাহাতে দণ্ড না পায় তাহার বিধান করিতে রাজা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। স্বদেশ পরিপালন রাজধর্ম্ম। স্বদেশ রক্ষার জন্য পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধ রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধে রাজা কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পলায়ন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। তবে যে ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়, জাতির ধ্বংস ও দেশের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, সে ক্ষেত্রে পলায়ন করিয়াও "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপিধনৈরপি।" নিজের জীবন রক্ষিত হইলে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় নিজকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করা সঙ্গত। সেনাপতির বর্ত্তমানে সৈন্য শ্রেণীভঙ্গ হয়। এই ক্ষেত্রে সেনাপতির জীবনের মূল্য সমধিক। সেনাপতির পক্ষে জীবন রক্ষার জন্য স্ত্রী

পুত্রকে পরিত্যাগও বিহিত। মহত্তর কার্য্য সম্পাদনের জন্য এরূপ আত্মত্যাগ বরণীয়। বিপদ উত্তীর্ণ হইলে সুস্থাবস্থায় পুনরায় শত্রুকে আক্রমণ করিবে। ইহাই ভারতীয় বিধান। যুদ্ধে আহূত হইলে ক্ষত্রিয় কখনই পশ্চাৎপদ হইবে না; এইরূপ বিধান থাকায় জাতি সমরনিপুণ ও যোদ্ধৃগুণ সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধই প্রধান অবলম্বন। শক্তিহীন কাপুরুষ দেশ শাসনের অযোগ্য। দুর্ব্বলের পক্ষে ধর্ম্ম হইতে পারে না। জাতির সবলতা প্রয়োজন। জর্ম্মণ সেনাপতি বার্ণহার্ডি তাঁহার "Germany and the Next War" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—A war is a biological necessity"—বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই যুদ্ধ আবশ্যক। জাতীয় জীবনের জন্য শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রের উৎকর্ষ যেরূপ আবশ্যক, ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য্যবত্তাও জাতীয় জীবনের সেইরূপ প্রধান অবলম্বন। রোগবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র "বিষস্য বিষমৌষধম"। জাতীয় বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রও যুদ্ধ। যুদ্ধ ভিন্ন বাঁচিবার পন্থা নাই। জগতে বৈষম্য আছে। যুদ্ধ চলিবেই। যুদ্ধের নিবৃত্তি অসম্ভব। শরীরের ক্রিমি বিনাশ না করিলে শরীর নষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও কাম ক্রোধাদি

রিপুর বিনাশ বা ধ্বংস আবশ্যক। ইহা ব্যতীত সাধনের তাৎপর্য্য অন্য কিছুই নহে। মনের মল বিদূরিত করাই সাধন। সাধনার মূলসূত্র মনের স্থৈর্য্য—চাঞ্চল্যের বিনাশ। রিপুসকল পরাহত না হইলে মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে জ্ঞানযুদ্ধ। জাতীয় উন্নতির মূলে বাহুবল ও মানসিক বলের যুদ্ধ। ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনে জাতীয় প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। উহার সহিত ব্রাহ্মণশক্তির গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হউক, জাতীয় জীবন মহাতীর্থে পরিণত হইবে। আপনার প্রভাবে অন্যান্য জাতিকেও প্রভাবিত করিবে। বাঁচিয়া থাকার তাৎপর্য্য বিকাশে। মিলের ভাষায় বলিতে হয় "Better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied." ও বলির ভাষায়—শত মূর্খ লইয়া স্বর্গবাস অপেক্ষা পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালবাসও শ্রেয়ঃ। দুর্ব্বলের সহবাসে মানুষ অপদার্থ হইয়া যায়। দুর্ব্বল রাজ্যে বাস মূর্খ লইয়া বাস করার মত। জীবনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, প্রতিভার বিকাশ হয় না, হতশ্রী হইয়া দুর্ব্বিষহ জীবন বহন করিতে হয়। জীবনের একটী মূল্য আছে। জাতীয় জীবনের মূল্য এই—তাহার প্রভাবে,

তাহার সত্তায়, তাহার দৃষ্টান্তে, তাহার সাহিত্যে, তাহার দর্শনে, অন্য জাতি জাগিয়া উঠে। প্রভাব বাহির হইতে হইলেও অন্য জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইয়া পড়ে। জাতীয় জীবন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইলে সেই জাতির ধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শন অন্য জাতির উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। জাতীয় সত্তা উপলব্ধি করিবার দুইটী দিক্—একটী জাতির চিন্তায়, অপরটী জাতির কার্য্যে। চিন্তা ব্রাহ্মণশক্তি,—দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও ধর্ম্মে প্রকাশিত। আর কর্ম্ম ক্ষত্রিয়-শক্তি,—ক্ষাত্রবীর্য্যে, শাসনযন্ত্র পরিচালনে, দেশকে সমৃদ্ধ করিতে, জাতিকে সংহত ও সংবদ্ধ করিতে অভিব্যক্ত। জগতের মূলে তিনটী শক্তি—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই তিন শক্তির উপরেই ভগবানের বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিতে প্রকট; ইচ্ছাশক্তি মনে ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণে অভিব্যক্ত। এই তিন শক্তিই আমাদের শরীর ধারণের মূল। জাতীয় জীবনের মূলেও এই তিন শক্তি। জ্ঞানশক্তি ব্রাহ্মণে, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ক্ষত্রিয়ে সমপরিমাণে কার্য্য করিতেছে। ইহার উপরেই শাসনযন্ত্র মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। প্রজা-

সমূহের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি রাজার ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। প্রাণ ক্রিয়ার আধার। প্রাণ সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতেছে, প্রাণের সহিত জড়ের যুদ্ধই জীবন। প্রাণিবিদ্যার (Biology) অনুশীলনে দেখিতে পাই, জড়ের সহিত সংগ্রামই প্রাণের ধর্ম্ম। জড় প্রাণকে অভিভূত করিতে চাহে, আর প্রাণ জড়কে অভিভূত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। প্রাণের যুদ্ধস্পৃহাতেই শরীর বিধৃত। শরীরকে বিধৃত রাখিবার জন্যই প্রাণ সর্ব্বদা সচেষ্ট। সমাজশরীর অক্ষত রাখিতে হইলেও সেইরূপ জড় ভাবের সহিত যুদ্ধ আবশ্যক। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের গলনালীর ভিতরে শ্বাসপ্রশ্বাসের যে যন্ত্রটী আছে তাহার মুখে,আহার করিবার সময়ে, কোনও দ্রব্য প্রবিষ্ট হইলে আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। জাতীয় শাসনযন্ত্র জাতির প্রাণস্বরূপ; সরল, সহজ, অবাধ গতিতে চলাই ইহার স্বভাব। এই অবাধ গতি রুদ্ধ হইলেই যুদ্ধ আবশ্যক। প্রাণপণে শ্বাসরোধক বস্তুটীকে অপসারিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রাণের অবাধ গতি রুদ্ধ হইলে জাতির বিষম অবস্থা উপনীত হয়। প্রাণের ধারা বন্ধ হইলেই

জীব মরিয়া যায়। সেইরূপ জাতীয় জীবনধারা পরাহত হইলেই জাতির মৃত্যু অবধারিত। অতএব জাতিকে বাঁচিতে হইলে যুদ্ধ আবশ্যক। মনু বলিয়াছেন—

"সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাং চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাং চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্ ॥৭।৮৮

সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হওয়া রাজার পক্ষে শ্রেয়ঃ সাধনের হেতু। বস্তুতঃ যুদ্ধ একটী যজ্ঞ। শাস্ত্রেও যুদ্ধকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। যজ্ঞ যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, যুদ্ধও তেমনই অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞের ফল স্বর্গ। যুদ্ধের ফলও স্বর্গ। ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ নিষ্কাম। উহা চিত্ত-শুদ্ধির কারণ। সেইরূপ ভগবানের জন্য—ধর্ম্মের জন্য —দেশের জন্য সংগ্রাম চিত্তশুদ্ধির কারণ। চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা এবং জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। যুদ্ধ ব্যাপারে স্মরণ রাখিতে হইবে, যুদ্ধ শুধু শান্তির জন্য—শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য। প্রাণের অন্তরালে শান্তির সৌধ রহিয়াছে। প্রাণের অন্তরালে জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ রহিয়াছে। যুদ্ধের অন্তরালেও শান্তি রহিয়াছে। শান্তির জন্যই যুদ্ধ। এই মহান্ সত্যটী স্থির রাখা কর্ত্তব্য। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন

—"মামনুস্মর যুধ্য চ" 'আমাকে স্মরণ কর ও তোমার স্বধর্ম্ম আচরণ কর'। যুদ্ধ যখন স্বধর্ম্ম, তখন যুদ্ধই আচরণীয়। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥" ৩।৩০

"নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আশা, মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর"। যাহার যাহা স্বধর্ম্ম তাহা ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহাতেই জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারে ভগবান্ লাভ হইতে পারে। ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মে হতস্য চ
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞ ইতি।"

সম্মুখ যুদ্ধে উদ্যতাস্ত্রে হত ব্যক্তির যজ্ঞফল লাভ হয়। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাই, যুদ্ধ যজ্ঞ।

"ব্রাহ্মণস্বান্যপজিগীষমাণো রাজা যো হন্যতে
তমাহুরাত্মযূপো যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণ ইতি।"

(আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র—২ অঃ, ১০ম পা ২৬ক ২য় সূত্র)

ইহার তাৎপর্য্য—যুদ্ধে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। শরীর এই

যজ্ঞের যুপস্থানীয়, অন্তরাত্মা পশুস্থানীয় এবং যুদ্ধ-প্রাপ্ত দ্রব্য উপযুক্ত ব্যক্তিতে দানই দক্ষিণা। ভগবৎ-প্রীতির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম ব্যাপক হয়,—ব্যাপক হইলেই শুদ্ধ হয়। বদ্ধ জল মুক্ত ও ব্যাপক হইলেই তাহার মলিনতা চলিয়া যায়। মনও সেইরূপ ব্যাপক হইলেই নির্ম্মল হয়। কর্ম্ম মনের সাহায্যে কৃত। কর্ম্মও যতই ব্যাপক হইবে ততই শুদ্ধ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মনও পরিস্কৃত হইবে। যুদ্ধরূপ যজ্ঞও ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত হউক। আত্ম-কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"অভ্যুদয়াঽর্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাঽভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বনে বিহিত প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি। কিন্তু এই ধর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়; কারণ

ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতা জন্মে। এই যোগ্যতা হইতে জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে মুক্তি লাভ হয়। অতএব প্রবৃত্তিলক্ষণ এই কর্ম্মও সহকারী রূপে মোক্ষের কারণ।

জগতের স্থিতির জন্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের বলে জগতের প্রবাহ চলিতেছে। জাগতিক প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্যই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ব্যবস্থেয়। ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,—

"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য স্থিতিং চিকীর্ষুর্ম্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। * * * দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মান ইতি" অর্থাৎ ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের স্থিতির জন্য মরীচি প্রভৃতিকে অগ্রে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। * * * বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তি-

লক্ষণ। ইহার মধ্যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম জগতের স্থিতির কারণ, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও মুক্তির হেতু। এই ধর্ম্ম শ্রেয়স্কামী ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও আশ্রমিগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত ইত্যাদি।

ভগবানের সৃষ্টির মূলেই জগৎরক্ষার ভাব। জগতের স্থিতির জন্য প্রবৃত্তিমার্গের আবশ্যকতা। উচ্চ আদর্শের —উচ্চলক্ষ্যের—জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য নিবৃত্তি-মার্গের প্রয়োজন। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইবার পূর্ব্বে প্রবৃত্তিমার্গের অনুশীলন আবশ্যক। যজ্ঞাদি প্রবৃত্তিমার্গের কার্য্য। যুদ্ধ, প্রজাপালন প্রভৃতি প্রবৃত্তি মূলক ধর্ম্ম। ইহা ভগবৎ প্রীতির জন্য—ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত হইলে পুরুষার্থের সহায় হয়।"কেবলমী-শ্বরার্থং তত্রাপি ঈশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি আসঙ্গং ত্যক্ত্বা।" অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরার্থ, ঈশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, এই আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা জীবনের পরিপূর্ণতার, মানবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সহায়ক হয়। অতএব যুদ্ধ মানবজীবন গঠনের অন্তরায় নহে, পরন্তু সহায়। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥"

অর্থাৎ এই লোকে দুই ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করে—এক যোগযুক্ত পরিব্রাজক, অপর সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি।

কেহ কেহ যুদ্ধের নামে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহারা ভগবানকে করুণাময় পালনকর্ত্তারূপে দেখিতে চান। তাঁহারা প্রকৃতির রমণীয়তা প্রত্যক্ষ করেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহাদের অস্ত্র। বস্তুতঃ, তাঁহারা একদেশদর্শী। ভগবান্ কেবল পালন কর্ত্তা নহেন, তিনি রুদ্ররূপী সংহারকর্ত্তাও। সৃষ্টি স্থিতি সংহার তাঁহার লীলা। স্থিতির জন্যই সংহার; ধ্বংসই সৃষ্টির ক্রম। ঝড়ে, বন্যায়, প্লাবনে তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকট। ঝড়ের অবসানে প্রকৃতি নির্ম্মল হয়, রোগের বীজাণু, কীটাণু প্রভৃতি বিদূরিত হয়। জীবের প্রাণ রক্ষা হয়। প্রকৃতির ঐ ভৈরবী মূর্ত্তিও মঙ্গলের নিদান। বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল, দেশের মল বিধৌত হইল, প্লাবনের ফলে জমিতে 'পলি' পড়িল। কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইল। দেশের মল বিধৌত হওয়াতে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হইল। জমিতে 'পলি' পড়ায় প্রাণরক্ষার উপযোগী শস্যসম্ভার বৃদ্ধি পাইল। রুদ্রমূর্ত্তি তাই মঙ্গলময়ী। প্রকৃতপ্রস্তাবে রুদ্রমূর্ত্তি

ভগবানই স্থিতির রক্ষক। সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের মধ্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। একেরই তিন প্রকারে প্রকাশ মাত্র। যাঁহারা ভগবানকে কেবল করুণাময় মূর্ত্তিতে দেখেন, তাঁহারা একদেশদর্শী ও ভগবানের প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারেন না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই শাসনবাক্য অতীব মহান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সাধারণের নহে। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই সামান্য বাক্য "পশুমালভেত" অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশুহত্যা করিবেক এই বিশেষ বাক্যদ্বারা বাধিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৈধ হিংসা ব্যতীত অন্য প্রকার হিংসা পরিবর্জ্জনীয়। বৈধ হিংসা ব্যতীত সংসার চলিতে পারে না। অহিংসাবাদীর উভয় দিকে সঙ্কট। এদিকেও হত্যা, অন্য দিকে হিংসা না করিলেও হত্যা। ক্রিমিকীট না মারিলে শরীর নষ্ট হয়; ইহাতেও হিংসা, আবার শরীরস্থ ক্রিমি মারিলেও হত্যা। এরূপ অস্বাভাবিক অহিংসাবাদ সর্ব্বনাশের কারণ।

জগতের স্থিতি রক্ষাই যজ্ঞ। যজ্ঞই ভগবান্। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" তাই জগতের স্থিতি রক্ষার জন্য শাসন প্রকৃত প্রস্তাবে বৈধ হিংসা। এরূপ হিংসা কখনও নিন্দিত হইতে পারে না। পিতামাতা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে

শাসন করেন, শিক্ষক ছাত্রকে তাড়না করেন, তাহা কখনও হিংসা হইতে পারে না। পুত্রের মঙ্গলই পিতা-মাতার কাম্য, ছাত্রের মঙ্গলই শিক্ষকের কাম্য। ইহাকে হিংসা বলা যাইতে পারে না। সকল কার্য্যই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতি দিয়া বিচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোনও কার্য্যেরই যথার্থ বিচার চলিতে পারে না। কর্ম্ম একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। যথা-সম্ভব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। বৌদ্ধগণ অহিংসারূপ ধর্ম্ম প্রচার করিল। তাহার ফলে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত জাতি-গুলি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ অপরিহার্য্য। বৌদ্ধগণ রাজ্য-স্থাপন ব্যাপারে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি করিল। অভিচারে বৌদ্ধসমাজ কলঙ্কিত হইল। এখনও অনেক দেশে বৌদ্ধগণ অন্য কর্ত্তৃক নিহত যে কোনও পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গই ভক্ষণ করে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। খৃষ্টান সমাজের মূলমন্ত্র ছিল—“এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দাও।” এই মহামন্ত্রে খৃষ্টানের দীক্ষা। কিন্তু ইউরোপের জলবায়ুর গুণে, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে খৃষ্টীয়

ইউরোপ নূতন মূর্ত্তিতে আবিভূ্ত হইল। ইউরোপে যিশুর ধর্ম্ম নূতন আকারে প্রকট হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে Dr. Harald Hoffding তাঁহার "Philosopy of Religion' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"Buddhism spread over Eastern Asia, clad in a flowing garment of mythological and liturgical forms. As a modern Buddhist has put it, 'it softened Asia.' But for the most part its effect has been damping, lulling, restraining, except where—as in the case of the Japanese it has encountered and been transformed by an active forward-pressing racial tendency, and by the influence of an earlier religion (SHINTOISM) which had specially developed the feelings of individuality and of nationality."

অর্থাৎ "বৌদ্ধধর্ম্ম উপাখ্যানও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের আবরণে সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করে। বর্ত্তমান কালের কোনও বৌদ্ধ বলিয়াছেন—

'বৌদ্ধধর্ম্ম এশিয়াকে শান্ত করিয়াছে।' কিন্তু অনেকাংশে ইহার ফলে তামসিকতা, অসারতা ও নির্জ্জীবতার প্রসার হইয়াছে। কেবল জাপানে এই ভাব প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। জাতীয় ভাব প্রণোদিত কর্ম্মপ্রবণতায় ও জাপানের পূর্ব্বতন (শিণ্টু) ধর্ম্মের প্রভাবে এই ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিণ্টধর্ম্ম ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তার ভাব পরিপুষ্ট করিয়াছে।" বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের দুর্দ্দশা হইয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যজ্ঞের গতি রুদ্ধ হওয়ায়, সকলকেই সন্ন্যাসের পথে—নির্ব্বাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় জাতি কর্ম্ম-কাতর, ভাবপ্রবণ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই ফলে জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়াছে। ডাক্তার হফ্‌ডিং বুদ্ধ ও খৃষ্টের তুলনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচনার যোগ্য। ডাক্তার হফ্‌ডিং বলিতেছেন,—

"The great importance attached to the life of expectation and striving was, however, of deep significance. Jesus's prophetic countenance, as well as the apocalyptic character of his ideas taught men by means of great figures

to look towards great aims—aims which are to be reached through time,and not through the overthrow of time. By means of transformations and adaptations this contribution to spritual life has been preserved to the continued life of the race, even though the narrow frame within which the contribution was originally presented has been destroyed. The struggling human will has found, in the great metaphors of Jesus, symbols it could adopt as its own. But for Bhuddha's ideas such a transformation and adaptation was not so easy ; he offered sedatives not motives ; hence his positive influece on spritual life and on the stream of culture was necessarily more restricted. Buddha's thoughts are like the grains of corn which neither destroyed nor fulfilled, still lie within Egyptian graves as they were laid centuries ago. But the thoughts

of Jesus have proved their fruitfulness; for, perishing in their original form, they have in virtue of this dissolution risen again to grow and work under new conditions throughout a succession of historical adaptations. Buddha softened Asia, but Jesus taught Europe a great Excelsior."

ইহার তাৎপর্য্য এই ঃ—উদ্যম ও আশাপূর্ণ জীবনের সবিশেষ মূল্য আছে। যিশুর মহাপুরুষোচিত মুখমণ্ডল এবং রহস্যপূর্ণ চিন্তার ধারা মানুষকে প্রত্যক্ষ আদর্শের সাহায্যে উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিয়াছে। এই লক্ষ প্রাপ্তি ইহ জীবনের কার্য্য, জীবনের পরপারে নহে। পরিবর্ত্তন ও সংস্করণের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের এই শ্রেষ্ঠ দান জাতির নিরবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহে রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্যই যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর দিয়া এই বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল সে গণ্ডী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যিশুর জ্বলন্ত উপমায় মানবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা গ্রহণযোগ্য অবলম্বন পাইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন বা সংস্করণ সেরূপ সহজ সাধ্য নহে। তিনি মজিয়া থাকিবার উপযোগী রস

প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কর্ম্মপ্রবণ রস নহে। তাই অধ্যাত্মজীবনে ও অনুশীলনের প্রবাহে তাঁহার বাস্তব প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; বুদ্ধের চিন্তাগুলি তুষবিহীন শস্যের মত বিনষ্টও হয় না, ফল-বান্‌ও হয় না; শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেলেও মিশর দেশীয় কবরস্থ 'মামি' গুলির ন্যায় একই অবস্থায় অবস্থিত থাকে। কিন্তু যিশুর চিন্তা ফলবতী হইয়াছে। যদিও মৌলিক আকারে তাঁহার চিন্তা বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি এই প্রলয়ের ফলে নূতন আকারে তাহা উদ্ভূত হইয়াছে ও নূতন অবস্থার ভিতর বৃদ্ধি পাইয়া কার্য্যকরী হইতেছে। বুদ্ধদেব এশিয়াকে দুর্ব্বল করিয়াছেন, কিন্তু যিশু আশার প্রদীপ জ্বালিয়া উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

বুদ্ধদেবের মত জ্ঞানের উপর, ও যিশুর মত ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধের ধর্ম্ম, মস্তিষ্কের ধর্ম্ম (Religion of the brain) বা জ্ঞানের ধর্ম্ম এবং যিশুর ধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম (Religion of the heart) বা ভাবপ্রবণ ধর্ম্ম। বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ বা ধারণা করা সুকঠিন। কিন্তু যিশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ। হৃদয়ের দিকে—ভাবপ্রবণতার দিকে ঝোঁক্ বেশী বলিয়া

যিশুর ধর্ম্মের ধারণা সহজসাধ্য। কিন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম বদলাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার হফ্‌ডিং বলিতেছেন, খৃষ্টান্‌ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, খৃষ্টান্‌ ধর্ম্ম ইউরোপে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টান্‌ ধর্ম্মে নিবৃত্তির ভাব অতিশয় প্রবল। সেই ভাব ভাঙ্গিয়া ইউরোপ নব ধর্ম্মের পত্তন করিয়াছে। ইহা খৃষ্টান্‌ ধর্ম্ম নামতঃ হইলেও কার্য্যতঃ নহে। ইউরোপের 'আবহাওয়ায়' যিশুর ধর্ম্ম বদলাইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ইউরোপে গেলেও বোধ হয় জলবায়ুর গুণে বদলাইয়া যাইত; কারণ ভারতবর্ষে দেশীয় খৃষ্টান্‌ সমাজ খৃষ্টধর্ম্মের রসাস্বাদ করিয়াও এদেশের জলবায়ুর গুণে যেমন তেমনই আছে। চীনদেশেও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। চীনের Sun Yat Sane (সান্‌ ইয়াট্‌ সেন) খৃষ্টান্‌। তাই আমাদের মনে হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মও ইউরোপে গেলে নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিত। বুদ্ধের ধর্ম্মমত ভারতে গঠিত। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা শান্ত। তাহাতে বিক্ষোভ বা চঞ্চলতা ছিল না; তাই বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতীয়তার কোনও প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্ব্বজনীনতায় বৌদ্ধধর্ম্ম

দেশ, জাতি ছাড়াইয়া বিশ্বে মিশিতে গিয়াছিল ; কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্ম তদানীন্তন আরবের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়া গঠিত হওয়াতে সাম্রাজ্য গঠনের অনুকূল হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতি এবং সাম্রাজ্য গঠনের ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র পরিচালনের উপযোগী হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী শিষ্যগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা কোনও প্রতিরোধ পায় নাই। ঘাত প্রতিঘাতে যে শক্তি ফুটিয়া উঠে, সে শক্তিও তাহাদের বিকাশ পায় নাই এবং তাহাতে জাতিগঠনেও বিশেষ উপকার সাধিত হয় নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের পার্শ্বে তাহা হইতেও উচ্চতর ও স্বাভাবিক হিন্দুধর্ম্মমত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে বিস্তৃত হইয়াছিল; হিন্দুধর্ম্ম জাতীয় জীবনের উপাদানে পরিপুষ্ট, বৌদ্ধধর্ম্ম পরগাছার মত জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে নাই। কিন্তু যিশুর শিষ্যগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছিল। রোম নগরীতে নিরোর অত্যাচারের অগ্নিপরীক্ষায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে খৃষ্টানধর্ম্ম অন্য কোনও প্রবল ধর্ম্মের পাশাপাশি ফুটে নাই। নিজের অপ্রতিহত গতিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তদানীন্তন

ইউরোপ রোমের শাসনযন্ত্র জয় করিয়া রোমীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ধর্ম্মরূপে নূতন বস্তু পাইয়াই ইউরোপ খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইউরোপের জাতীয়তা বোধ অতীব জাগ্রত। সেই দেশপ্রাণতা ও জাতীয়তার সহিত খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম মিলিত হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম গৌণরূপে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছে, মুখ্যরূপে নহে। ইহাকে খৃষ্টান্‌ধর্ম্মের প্রভাব না বলিলেও চলে। বরং ইউরোপীয় বিজ্ঞান ইউরোপকে জীবিত রাখিয়াছে এবং বিজ্ঞানের প্রভাবে খৃষ্টান্ ধর্ম্মের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে বলিলেও ক্ষতি হয় না। অবশ্যই খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম ইউরোপের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতীয়তা অনুশীলনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ইহা বলিতে পারা যায় না। পোপের সহিত বিরোধের ফলে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। মধ্যযুগে পোপের ক্ষমতা বিধ্বস্ত করিতে গিয়া জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ডাক্তার হফ্‌ডিংয়ের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম দুইই অত্যন্ত নৈতিকতাপূর্ণ। নিবৃত্তির বাড়াবাড়ি উভয় ধর্ম্মেই প্রবল। আমাদের মনে হয়, উভয় মতই

অল্পাধিক পরিমাণে জাতীয়তার বিরোধী। কিন্তু য়িহুদী ধর্ম্মমত অনেক পরিমাণেই তাহাদের জাতীয়তা রক্ষার অনুকূল। ভারতীয় ধর্ম্মমতের বিশেষত্ব—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের, সামাজিক জীবনের ধারা নির্দ্দেশ করিতেছে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম মহানের সহিত মহামিলনের সমস্যা পূর্ণ করিয়া মানব জীবনের পূর্ণতা সংসাধন করিতেছে। 'অহিংসা' প্রভৃতির বাড়াবাড়ি, সন্ন্যাসের 'বাতিক' জাতীয় জীবনকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। অতএব অহিংসা প্রভৃতি মতবাদ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। ভারতে রাষ্ট্রীয়শক্তি বিবর্দ্ধনের জন্য পররাজ্য আক্রমণ, শত্রুর নির্য্যাতন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্র বলিতেছেন—"শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিয়া তদ্দেশ অবরোধ করিবে, শত্রুরাজ্যে উৎপীড়ন করিবে, অশ্ব প্রভৃতির আহার্য্য ঘাস অগ্নি-প্রদানে নষ্ট করিবে, অন্ন ধ্বংস করিবে, খাদ্যাদির আমদানি রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিবে। শত্রুর দেশে জল প্রভৃতি বিষ প্রদানে দূষিত করিবে এবং জ্বালানি কাষ্ঠাদি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিবে, জলাশয়াদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, প্রাকার পরিখা নষ্ট করিবে। নিদ্রিত

অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবে এবং রাত্রিতে শত্রুর ভয়োৎপাদন করিবে। সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে শত্রু নির্য্যাতিত না হইলে যে কোনও প্রকারেই হউক, এমন কি বঞ্চনাদি দ্বারাও যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাজিত করিবে।" * ইহা ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের" অনুশাসন। পক্ষান্তরে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র

* উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা॥
ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুদ্ধেত সংযত্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥

মনু, ৭।১৯৫, ১৯৬ ও ২০০।

এই সকল অনুশাসন Practical Politicsএর অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সর্ব্বত্রই এই সকল নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত নৈতিকতা (Morality) জাতীয়তার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিসর্জ্জিত হয়। মনুর এই সকল অনুশাসন দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে পারে এ স্থানে মনুর সহিত Machiavelliর সাদৃশ্য আছে। Machiavelli বলিয়াছেন,---"Where the safety of one's country is at stake, there must be no

বলিতেছে—"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" ভারতীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আদর্শ উদাত্তকণ্ঠে ঋষিগণ উদ্ঘোষিত করিয়াছেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" ভারতের প্রাত্যহিক প্রার্থনায় শুনিতে পাই "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।" ভারতের জীবনাদর্শ নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥"

কোমলে কঠোর, রৌদ্রে করুণ, এই অপূর্ব্ব ভাবের

---

consideration of what is just or unjust, merciful or cruel, glorious or shameful; on the contrary, every thing should be disregarded save that course which will save her life and maintain her independence"—Discourse III, 41.

আমাদের মনে হয় মনুর সহিত Machiavelliর সাদৃশ্য নাই; কারণ, মনু সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায় প্রথমে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন, এই তিন উপায় বিফল হইলে যুদ্ধ বঞ্চনাদি করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আজকাল সকল যুদ্ধেই এই সকল নিয়ম অবাধে চলিতেছে।

সংমিশ্রণই ভারতীয় চিন্তার বিশেষত্ব। এই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য বিধানই ভারতীয় সাধনার মহিমা। যুদ্ধ ধর্ম্ম, যুদ্ধ ভগবান্, যুদ্ধ যজ্ঞ, যজ্ঞই কর্ম্ম। বেদে কর্ম্মের উৎপত্তি। বেদের উৎপত্তি ভগবান্ হইতে, ভগবান্ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" ৩।১৫

সর্ব্বগত ব্রহ্মই সমস্ত যজ্ঞে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধ-যজ্ঞের তিনিই হোতা, তিনিই উদ্গাতা, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই অধ্বর্য্যু। যুদ্ধযজ্ঞের কর্ত্তা তিনি, কর্ম্ম তিনি, করণ তিনি। তাঁহাতেই সম্প্রদান, তাঁহাতেই যুদ্ধের উৎপত্তি। তিনিই যুদ্ধযজ্ঞের অধিকরণ। যাজ্ঞিকের ভাষায় বলিতে গেলে—তিনি অর্পণ বা হোতা, তিনিই হবি। তিনিই অগ্নি, তিনিই আহুতিদাতা, যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্র অর্পণ, শত্রুই হবি, পরস্পরের সঙ্ঘর্ষই যুদ্ধাগ্নি এবং বীরপুরুষই আহুতি প্রদাতা। এই যজ্ঞই জাতীয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

যুদ্ধসম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম—যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ তাহাও এস্থলে

আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও দূত অবধ্য। ইউরোপে হেগ্ নগরীতে সভা স্থাপিত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে। ভারতীয় শাস্ত্রে পরস্পর যুধ্যমান্ জাতির সামরিক ব্যবহার সম্বন্ধে উদার মত ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্র বলিতেছেন—কূট অস্ত্রে আঘাত করিবে না।* কর্ণাকার ফলকযুক্ত বাণ, বিষদিগ্ধ বাণ ও অগ্নিতে উত্তপ্ত বাণ দ্বারা আঘাত করিবে না। রথ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি স্থলারূঢ়, যে ব্যক্তি পৌরুষহীন, যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ, যে ব্যক্তি যুদ্ধে উপরত হইয়া আসীন অবস্থায় আছে, যে ব্যক্তি "তোমার আমি" এই বলিয়া শরণাগত, তাঁহাকে আঘাত করিবে না। যে ব্যক্তি সুপ্ত, যে ব্যক্তি পরিশ্রান্ত, যে ব্যক্তি নগ্ন, যে ব্যক্তি নিরায়ুধ ও যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখিতেছে, কিন্তু যুদ্ধ করিতেছে না—এরূপ ব্যক্তিকে এবং যে অপরের সহিত সংগ্রামে রত এরূপ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে ব্যক্তির অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত আহত হইয়াছে, যে ভীত,

* যাহার উপরে কাষ্ঠাদি আছে, কিন্তু ভিতরে তীক্ষ্ণাস্ত্র রহিয়াছে। মনু ৭।৯১, ৯২।

রাজনীতি।

যে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এমন ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না।

এই অনুশাসনই আন্তর্জ্জাতিক নিয়মের কার্য্য করিত। বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। আততায়ীর দণ্ডবিধান সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য; যথা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যুদ্ধোপরত দ্রোণাচার্য্যকে বধ করা, সাত্যকি ও ভুরিশ্রবার যুদ্ধ সময়ে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভুরিশ্রবা আহত হওয়া, কর্ণের রথচক্র মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে তাঁহাকে বধ করা প্রভৃতিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে দুর্য্যোধন আততায়ী, সে অগ্নি ও বিষ প্রদান করিয়াছে। অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ধনাপহরণ করিয়াছে। রাজ্য দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলিত হইয়া হত্যা করিয়াছে। অতএব এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়মাবলী রক্ষিত হয় নাই। বরং—

"নাততায়ীবধে দোষো হন্তু র্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাহপ্রকাশং বা মন্যু স্তৎ মন্যুমৃচ্ছতি॥"

এই অনুশাসন বলেই আততায়ীর বিনাশ সাধিত হইয়াছে।

রাজার ব্যক্তিগত নিয়ম—রাজা শত্রুজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আত্মজয়ী হইবেন। তৎপরে নিজের ভৃত্যদিগকে দান মানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া নিজের বশে রাখিবেন। ইহার পরে নগরবাসী ও দেশবাসীকে বশীভূত করিয়া দেশের ও দশের সম্মতি ক্রমে, শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। বিষ্ণুপুরাণ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"কামঃ ক্রোধো মদো মানো লোভো হর্ষস্তথৈব চ।
জেতব্যো রিপুষড়্বর্গ আন্তরপৃথিবীক্ষিতা॥"

অর্থাৎ রাজা কাম, ক্রোধ, মদ, মান, লোভ, হর্ষ প্রভৃতি আন্তরিক ষড়্রিপুকে পরাজিত করিবেন এবং—

"এতেষাং বিজয়ং কৃত্বা কার্য্যো ভৃত্যজয় স্তথা।
কৃত্বা ভৃত্যজয়ং রাজা পৌরান্ জানপদান্ জয়েৎ।
কৃত্বা চ বিজয়ং তেষাং শত্রূন্ বাহ্যাং স্ততো জয়েৎ॥"

আন্তরিক রিপু জয় করিয়া ভৃত্যগণকে বশীভূত করিবেন। ভৃত্যজয় হইলে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণকে নিজের বশে আনিবেন ও তৎপরে শত্রুজয়ে

প্রবৃত্ত হইবেন। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়জিৎ না হইলে প্রজাগণকে স্ববশে রাখা যায় না। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজের বিলাসে জাতিকে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত করিয়া তোলে। যাদবগণ উচ্ছৃঙ্খলতায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের বিলাসে, তাহাদের অত্যাচারে সকলে প্রপীড়িত হইবে বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অজিতেন্দ্রিয় বলিয়াই তাহারা আত্মকলহে বিনষ্ট হইল। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা বিলাসী, যাহারা কামুক, তাহারাই সামান্য বিষয় লইয়া আপনাদের ভিতরে বিবাদের সৃষ্টি করে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরবশ। পরবশ বলিয়াই তাহার প্রভাব কাহারও উপরে বিস্তৃত হইতে পারে না। যোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচর্য্যজনিত বীর্য্য না থাকিলে শিষ্যদিগকেও উপদেশ দিতে পারা যায় না। মনুও রাজার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥"

অর্থাৎ রাজা দিবানিশি ইন্দ্রিয়-জয়রূপ যোগ অবলম্বন করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই প্রজাকে স্ববশে রাখিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ মনু রাজাকে কামজ

দশটী ব্যসন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মৃগয়া, অক্ষ-ক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রী, মদ, নৃত্যগীত-বাদিত্র, বৃথা ভ্রমণ—এই দশটী কামজ ব্যসন। ক্রোধজ ব্যসনও পরিত্যাজ্য। ক্রোধজ ব্যসন আটটী। বন্ধু-বর্গের দোষাবিষ্কার, সাধু ব্যক্তিগণের নিগ্রহ অথবা উত্তম ব্যক্তিকে নীচকার্য্যে নিয়োগ, অল্প অপরাধে অধিক দণ্ড, ঈর্ষা, অসূয়া, অর্থাপহরণ ও বাক্-পরুষতা—এই সকল ক্রোধজ ব্যসন। এই কাম ও ক্রোধের মূলে লোভ। লোভ হইতে কামের উদ্ভব। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধ জন্মে। অতএব ইহাদের মূলীভূত লোভ জয় করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ড, বাক্‌পারুষ্য ও অর্থাপহরণ এই সাতটি ব্যসন রাজার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখপ্রদ। ব্যসন ও মৃত্যু—ইহার মধ্যে ব্যসন কষ্টতর। কারণ, ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃই অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং অব্যসনী ব্যক্তি মরিয়া স্বর্গলাভ করে। ভারতে মুসলমান রাজত্বের অধঃপতনের এক প্রধানতম কারণ—বিলাসপরায়ণতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা। রোমসাম্রাজ্যের পতনের কারণ অতিলোভ ও সাম্রাজ্যমদমত্ততা।

ভারতে রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্যোতক; কিন্তু নারায়ণ যজ্ঞেশ্বর বলিয়া সাম্রাজ্যমদমত্ততা ও রাজনৈতিক অত্যাচার সম্ভবপর হয় নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। অত্যধিক লোভে জাতীয় চরিত্র কলুষিত হয়। ইউরোপের অতি লোভ 'Scramble for Africa'য় পরিব্যক্ত। আফ্রিকাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ভাগ করিতে ইউরোপ ব্যস্ত। এই লোভের ফল হয় ত ইউরোপকে সুদে আসলে ভোগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ; যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণার্পণ করিয়া কৃতার্থ। যুধিষ্ঠির মদান্ধ হন নাই। ছত্রপতি শিবাজী গুরু শ্রীরামদাসস্বামীকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহারই রাজ্য মনে করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গুরুর মুখে বলিয়াছেন,—

"তোমাকে করিল বিধি
ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম্ম
জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন॥"

ভারতীয় মতের বিশেষত্ব।

ভারতীয় আদর্শ কবির ভাষায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভাবের অনুপ্রাণনায় ভারতীয় শাসন যন্ত্রে মদমত্ততা প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ভারতে রাজা "অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব বিশ্বে" ছুটাইয়াও মদমত্ত হন নাই। যজ্ঞের ফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই মত্ততা আসিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়জিৎ ব্যক্তিই এই কর্ম্মফলার্পণে অধিকারী। রাজার রাজ্য-শাসন কর্ম্মযোগ। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ।" পররাজ্য আক্রমণ কর্ম্মযোগ, সাম্রাজ্যগঠন কর্ম্মযোগ, শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা কর্ম্মযোগ। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কর্ম্মযোগে অধিকার নাই। জিতেন্দ্রিয়তা রাজার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

নিজকে জয় করিয়া ভৃত্যবর্গকে বশীভূত করিবেন। কারণ, তাহারা বশবর্ত্তী না থাকিলে শত্রু তাহাদিগকে 'হাত' করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। গৃহশত্রুর ন্যায় ভীষণ শত্রু আর নাই। ভৃত্য-বর্গের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের স্বভাব। কিন্তু তাহারা অবিশ্বাসী হইলে সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্বন্ধেও মনুবাক্য অনুসরণীয়।

রাজনীতি।

"অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসীকেও অতিরিক্ত বিশ্বাস করিবে না।" অতিবিশ্বাসের ফলে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী 'বেইমান' মিরজাফর সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। পক্ষান্তরে একেবারে বিশ্বাসহীন হইলেও চলিবে না। অবিশ্বাসে আরংজেব মোগল সাম্রাজ্যে ধ্বংসের বীজ বপন করিয়াছিলেন। লোকের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন হইলে লোক বিশ্বস্ত থাকিতে পারে না। মানবীয় মনোরাজ্যে— বিশ্বাসের ফল বিশ্বাস। অপরকে বিশ্বাস না করিলে তাহার প্রত্যেক কার্য্যে সন্দিহান হইলে তাহার পক্ষে বিশ্বাসী থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে অবিশ্বাস করে তাহার সেই অবিশ্বাস অপরে সংক্রামিত হয়। সামঞ্জস্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। অতি বিশ্বাসও করিবে না, অত্যন্ত অবিশ্বাসও করিবে না। নিজের দেশীয় লোকের সম্মতি গ্রহণ না করিলে যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। দেশবাসী যখন দেশপ্রাণতায় সমরানলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, যখন দেশমাতৃকার সেবায় জনপদবাসী আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প, যখন দেশের ধন, জন, সুখ, স্বাস্থ্য সকলই দেশের জন্য, রাজার জন্য উৎসর্গীকৃত, যখন দেশের জনসাধারণও দেশের সমৃদ্ধির জন্য আক্রমণ

করিতে ইচ্ছুক, তখনই পররাষ্ট্র আক্রমণ কর্ত্তব্য। দেশস্থ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পররাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যুদ্ধঘোষণার কাল—কখন যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে তৎপ্রসঙ্গে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"যখন দেখিবে প্রজাগণ উৎসাহযুক্ত ও অনুরাগী, দান মানাদি দ্বারা বশীভূত এবং নিজের ধনাগার পরিপূর্ণ, তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। যখন বুঝিতে পারিবে নিজের সৈন্যগণ হৃষ্টপুষ্ট এবং শত্রুর সৈন্য তদ্বিপরীত তখনই শত্রুকে আক্রমণ করিবে।*" বস্তুতঃ এই শুভ যোগেই যুদ্ধযাত্রা সমীচীন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোভন অনুশাসন আর কিছুই হইতে পারে না। যখন নিজে দেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান, প্রজাগণ অনুরক্ত, সৈন্যসমূহ হৃষ্টপুষ্ট, শত্রু দুর্ব্বল, তখনই আক্রমণ যুক্তিযুক্ত। সময়নিরূপণ প্রসঙ্গে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও মনোজ্ঞ। যখন বর্ষার অবসান, যখন পৃথিবী শস্যশালিনী, যখন সৈন্যগণের খাদ্যাভাব হইবে না তখনই যুদ্ধযাত্রা করিবে। অগ্রহায়ণ অথবা ফাল্গুন চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা

* মনু সপ্তম অধ্যায়, ১৭০।১৭১ শ্লোক।

প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সময়ই যুদ্ধযাত্রার বিশেষ অনুকূল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী অনুশাসনে বলা হইয়াছে, যখন দেখিবে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী, তখন যে কোনও কালেই যুদ্ধযাত্রা করিবে। অবশ্য দেশভেদেও কালের ইতরবিশেষ হইতে পারে। জয়ের আশা থাকিলে যে কোনও কালেই যুদ্ধারম্ভ করা যাইতে পারে। মনু বলিতেছেন—

"অন্যেষ্বপি তু কালেষু যদা পশ্যেৎ ধ্রুবং জয়ম্।
তদা যায়াৎ" ইত্যাদি।

অতএব সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি উদার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও স্পষ্টরূপে তিনি বলিয়াছেন— "বিগৃহ্যৈব ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ" অর্থাৎ শত্রুর বিপদ সময়েই শত্রুকে আক্রমণ করিবে।

যুদ্ধযাত্রার বন্দোবস্ত—রাজা নিজের রাজ্য-রক্ষার উপযোগী দুর্গাদির বন্দোবস্ত করিবেন। সৈন্যদ্বারা দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পরদেশ আক্রমণোপযোগী যানবাহন, অশ্বাদি ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, শিবিরের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হইবেন। * ইহা "মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের"

মনু, ৭।১৮৪।১৮৫।

ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—"সাম্পরায়িক-কল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ।" ইহার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"স চ সৈন্যনিবেশ স্তেষু তেষু চ স্থানেষু স্থাবরজঙ্গমদণ্ডো বহুমুখপরিঘফলকশাখাভিঃ প্রাকার ইত্যাদিস্তাদৃশস্থাপিতবিশেষতস্ত যাত্রাগতঃ" অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম বহুমুখ ও বৃক্ষ শাখা সহযোগে প্রাকার (Trench) ইত্যাদি খনন করিয়া আত্মরক্ষার উপযোগী বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রসর হইবে। সৈন্য-সন্নিবেশ সম্বন্ধেও নানারূপ ব্যূহনির্ম্মাণের উপদেশ দেখিতে পাই। যেরূপ উপায়ে সুবিধা হইতে পারে তদ্রূপ বিবেচনা করিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিতে হইবে। দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচি, গরুড়, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি ব্যূহ রচনা করিবার বিধান দেখিতে পাই। সম্মুখে বলাধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাতে সেনাপতি, উভয় পার্শ্বে হস্তী, হস্তিসমূহের নিকটে অশ্ব, তৎপরে পদাতি; এই প্রকারে দণ্ডাকার সৈন্য সন্নিবেশই দণ্ডব্যূহ। সূচিব্যূহ বর্ত্তমানের Phalanx এর মত। অগ্রভাগ সূচ্যগ্রের ন্যায় ও পশ্চাদ্ভাগ স্থূল—ইহাই সূচি-ব্যূহ। এই সকল ব্যূহ সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্র দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমরা অধিক লিখিলাম না।

রথী, পদাতি, অশ্বারোহী ও গজারোহী এই চারি প্রকারের সৈন্যের উল্লেখ ভারতীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নৌযুদ্ধ সম্বন্ধেও মনুর বিধান দেখিতে পাই। তিনি বলিতেছেন—"নৌদ্বিপৈস্তথা।" বৃক্ষ ও গুল্মে সংচ্ছন্ন থাকিয়া যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অল্প সৈন্যে সূচিব্যূহ ও বহুসৈন্যে বজ্রব্যূহ রচনা করিবার ব্যবস্থা 'মানবধর্ম্মশাস্ত্রে' দেখিতে পাই।

মিত্র, উদাসীন ও মধ্যম প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধান—মিত্র ও উদাসীনের (Allies and neutrals) ব্যবহার সম্বন্ধে এবং শত্রুর মিত্রগণের ও শত্রুসেবিগণের আচরণ রাজাকে বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইবে। শত্রু ও নিজের মধ্যবর্ত্তী রাষ্ট্রের (Buffer state) ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধান আবশ্যক। মনু বলিতেছেন,—

"মধ্যমস্য প্রচারং চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতম্।
উদাসীন প্রচারং চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ॥ ৭।১৫৫
অনন্তরং অরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেবচ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃপরম্॥" ৭।১৫৮।

শত্রু, শত্রুর মিত্র, উদাসীন (Neutral) ও মধ্যমকে (Buffer state) সাম, দান, ভেদ প্রভৃতির যে

কোনটী দ্বারা অথবা সমস্ত দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবে এবং অসমর্থ হইলে দণ্ড দ্বারা নির্য্যাতন করিবে। সর্ব্বশেষ দণ্ডপ্রয়োগই বিধি (Ultima ratio regum)। শত্রুপক্ষীয় মিত্রগণের ভিতরে দ্বৈধীভাব বিস্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকিতে হইবে। শত্রুর সহিত তাহার ভৃত্য ও অমাত্যগণের ভেদ জন্মাইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে হইবে। চরদ্বারা শত্রুর গতিবিধি ও শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ভৃত্য প্রভৃতির সন্ধান লইতে হইবে এবং সেই ভৃত্য প্রভৃতিকে দান মানাদির দ্বারা নিজের বশীভূত করিয়া লওয়া রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিবে না। যুদ্ধ কখনও নিজের জন্য কখনও বা মিত্রের জন্য করিতে হয়।*

যুদ্ধকালে সাধারণ কর্ত্তব্য—যুদ্ধকালে নিজ সৈন্যসমূহের মনোভাব ও চেষ্টা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। তাহাদের নৈতিক বল যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

* "স্বয়ং কৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ॥"
৭।১৬৪ (মনু)

নৈতিক বলের উপরেই যুদ্ধ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। নৈতিক বল (Espirit de corps) না থাকিলে সৈন্যগণ বিচলিত হয়। সৈন্যগণকে উৎসাহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সৈন্যগণের নৈতিক বল পরীক্ষা করাও সঙ্গত এবং শত্রুর প্রতি সৈন্যগণের ভাব কিরূপ তাহাও অবধারণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।* প্রচ্ছন্ন শত্রুকে সর্ব্বদাই ভয় করিতে হয়। শত্রুসেবায় নিয়োজিত ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যাগত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। শত্রু, মিত্র উদাসীন কেহই যাহাতে পরাভূত করিতে না পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করাই রাজনীতির অনুমোদিত। মনু বলিতেছেন,—

"যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ॥" ৭।১৮০

ইহাই রাজনীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন। জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে হইলে এই মতের অনুবর্ত্তন সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। যে ক্ষেত্রে শত্রু প্রবল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সাধু ব্যক্তির আশ্রয় লইবে। ইহার নাম

* "প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি॥" ৭।১৯৪ (মনু)।

সংশ্রয়। অর্থ সম্পাদনের জন্য, শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া এবং ভাবী পীড়ার আশঙ্কায় সাধু ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাধু ব্যক্তি কে? যাহাদিগের নিকট কোনও প্রকার অসদাচারণ আশা করা যায় না এবং যাহারা বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ তাহারাই সাধু। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। দুষ্টলোকের লক্ষণ এই :—

"দত্বানুতাপঃ কৃতপূর্ব্বহোমং বিমাননাদুশ্চরিতানি কীর্ত্তনম্।
দৃষ্টৈরদানং প্রতিকূলভাষণমেতাশ্চ দুষ্টস্য ভবন্তি বৃত্তয়ঃ॥"

শত্রুকে প্রবল মনে করিলে সামাদিদ্বারা সান্ত্বনা করিতে হয় এবং যে ক্ষেত্রে শত্রু অতিশয় প্রবল সে ক্ষেত্রে নিজের সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দুর্গে রাখিবে এবং অন্যভাগ লইয়া যুদ্ধকরিবে। ইহাই "Reserve force" রাখিবার বিধি। এ সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা আরও পরিষ্কাররূপে অন্যত্র দেখিতে পাই। মনু বলিতেছেন, "কৃত্বা বিধানং মূলে তে যাত্রিকং চ যথাবিধি।" মূলে সৈন্য রাখাই "Reserve force"। যে ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাভূত করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না, সে ক্ষেত্রে "তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং

ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্” অর্থাৎ শীঘ্রই কোনও ধার্ম্মিক ও বলবান্ নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। কিন্তু তাহার দোষ দেখিতে পাইলে, সে রাজা দুষ্টপ্রকৃতি হইলে, “সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্ব্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ।” তাহার সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবে।

রাজার চিন্তনীয় বিষয় ছয়টি,—সন্ধি. বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (শত্রু আক্রমণার্থ গমন), আসন (শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন), দ্বৈধীভাব (সৈন্যসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা—একদল ‘রিজার্ভ’ সৈন্য, অন্যদল সম্মুখ যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত সৈন্য) ও সংশ্রয় (সাধু ও বীর নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ)। এই ছয়টী বিষয়ে রাজাকে সর্ব্বদাই অবহিত হইয়া চিন্তা করিতে হইবে এবং যে সময়ে যেটী আবশ্যক, সে সময়ে সেইটী অবলম্বন করিতে হইবে।* সন্ধি দুই প্রকার—প্রথমতঃ, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সন্ধি করা ; দ্বিতীয়তঃ,স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্ধি করা। সন্ধি ফলানুসারেও দ্বিবিধ—প্রথম, বর্ত্তমান কালে ফলদায়ক ; দ্বিতীয়, ভবিষ্যতে ফলদায়ক। নিজে যখন জয়যুক্ত

---

* মনু ৭ম অঃ ১৬০।১৬১ শ্লোক।

তখনই সন্ধির উপযুক্ত কাল। যখন ধনাদি অল্প পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছে তখনই সন্ধির শুভ অবসর।* কারণ, ধনাদি বহুল পরিমাণে ব্যয়িত হইলে আর্থিক অবনতি হয়, বাণিজ্য বিনষ্ট হয়, অর্থাভাবে রাজ-কার্য্য পরিচালনে অসুবিধা হইয়া পড়ে। বিগ্রহ দুই প্রকার—এক, আপন দেশের জন্য; অপর, মিত্রের রাজ্য রক্ষার জন্য। মিত্র রাজাকে রক্ষা না করিলে, মিত্রের জন্য পরের সহিত সংগ্রাম না করিলে চলিতে পারে না। অন্যের দেশ আক্রমণ করিতে হইলে সাহায্যকারী থাকে না। ইহাই Offensive and defensive alliance—আক্রমণ ও প্রতিরোধের জন্য বন্ধুতা আবশ্যক। সন্ধির সময়েও মিত্ররাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্ধি করিতে হইবে। শত্রুকে আক্রমণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে যুদ্ধযাত্রা (যাঁন) দুই প্রকার—প্রথম, সুবিধা হইলে একাকীই অগ্রসর হইবে; দ্বিতীয়, অশক্ত হইলে মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে। শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনও নিজের জন্য ও মিত্রের জন্য—এই দুই প্রকার। নিজের অবস্থা দুর্ব্বল হইলে,

* মনু ৭ম অঃ ১৬৯ শ্লোক।

ধনাগারে ধন সঞ্চিত না থাকিলে আসন বা উপেক্ষা অবলম্বনীয়। নিজে সমৃদ্ধ হইলেও মিত্রের জন্য— মিত্রের অশক্তির জন্য শত্রুকে আক্রমণ না করিয়া অবস্থান করিবে। সৈন্যবলের স্থিতি ও কার্য্যসিদ্ধির জন্য এবং সেনাপতি প্রভৃতির রক্ষা ও তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। ইহাই দ্বৈধীভাব। দ্বৈধীভাব সম্বন্ধে কামন্দকীয় একটী বচন দৃষ্ট হয়—"দ্বৈধীভাবেন বর্ত্তেত কাকাক্ষিবদলক্ষিতঃ"। কাকের চক্ষু যেমন উভয় দিকই দেখিতে পায়, সেইরূপ ভাবে উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অলক্ষিত ভাবে অতি গোপনে সকল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থান করিবে। শত্রু প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোনও সাধু, বীরহৃদয়, পরাক্রান্ত নরপতির আশ্রয় গ্রহণই শ্রেষ্ঠ। এই ছয়টী বিষয় সর্ব্বদা রাজার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মিত্র ও উদাসীনের গুণ—মিত্রের গুণ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নহে। ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, তুষ্টপ্রকৃতি, অনুরক্ত ও অচঞ্চলচিত্ত মিত্রই গ্রাহ্য। *

* মনু ৭।২০৯।

যে ব্যক্তিতে শঠতা নাই, যাহার যোগ্যাযোগ্য বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, যে ব্যক্তি বীর্য্যবন্ত, যে দয়া প্রকাশের ক্ষেত্র জানে, যে দাতা—সেই ব্যক্তি উদাসীন (Neutral)। *

শত্রু—যে শত্রু বুদ্ধিমান, সৎকুলোদ্ভব, শূর, দক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন তাহাকে পরাজয় করা সুকঠিন। † শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা দেখিলে ভারতীয় শাস্ত্রের উদারতায় মুগ্ধ হইতে হয়। এমন উদার ও মহান্ ভাব কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের বিধান এই—"বিজিত দেশের দেবগণকে পূজা করিবে। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিবে। জনপদবাসিগণকে অভয় প্রদান করিবে। তদ্দেশবাসিগণের বলবতী ইচ্ছানুসারে সেই রাজবংশের কাহাকেও সিংহাসন প্রদান করিবে এবং পূর্ব্ব অমাত্য প্রভৃতিকেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। তদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম্মই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কোনও রূপে ধর্ম্ম বিনাশ করিবে না। নূতন রাজা ও প্রধান প্রধান পুরুষগণকে নানাবিধ রত্নাদি দ্বারা

* মনু ৭।২১১। † মনু ৭।২১০।

পূজা করিতে হইবে।” * এইরূপ উদারতায় ভারতীয় অনুশাসন পূর্ণ। বাস্তবিক ভক্তিপ্লুতচিত্তে ভারতীয় অনুশাসনের সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। রাজন্যবর্গের এই অনুশাসন অনুসারে চলা উচিত। এই প্রসঙ্গে মনু বলিতেছেন,—

“আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে॥” ৭।২০৪

অর্থাৎ বলপূর্ব্বক গ্রহণ অতীব অপ্রিয়কর এবং দান অতি প্রিয়কারক। অভীপ্সিত বস্তু উপযুক্ত সময়ে প্রদান করিলে তাহাই প্রশস্ত। উপযুক্ত সময়ে দান না করিলে—সময় বহিয়া গেলে—দান করিলেও কোন ফলোদয় হয় না। দানেরও শুভক্ষণ (Psychological moment) আছে। ক্ষুধার সময় চলিয়া গেলে বহু আহার্য্য বস্তু প্রদান করিলেও তাহা বরণীয় হয় না। “গেলে হে ক্ষুধার সময়, ভাল লাগে না সুধা দিলে।” অমৃতেও অরুচি জন্মে। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় না করিয়া তাহাকে দান করিবে—এরূপ উদার বিধান অন্য

* মনু ৭।২০১—২০৩।

কোথায়ও আছে কি? ইউরোপে সাম্যবাদী, সমাজ-তন্ত্রবাদী, মানবপ্রেমবাদী (Humanist) ইহা অপেক্ষা উদারতর মত পোষণ করেন কি? মনু বলিতেছেন—হিরণ্য ভূমি প্রভৃতি পাইয়া রাজা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না। পরন্তু ধ্রুব-স্বভাব মিত্রলাভ তাঁহার ভবিষ্যৎ শক্তির সহায়।*

যুদ্ধপ্রসঙ্গে মনু যে কয়েকটী সাধারণ উপদেশ দিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়। সকল অবস্থায় সকল দেশে সকলের পক্ষেই উহা অমৃতোপম। মনু বলিতেছেন,—

"আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ
অতীতানাং চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ॥" ৭।১৭৮

অর্থাৎ সকল কার্য্যের আগামী ফল, বর্ত্তমানের ফল ও অতীতের ফল এবং গুণ ও দোষ তত্ত্বতঃ বিচার করিবে।

"আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে॥" ৭।১৭৯

অর্থাৎ যে ভবিষ্যতের গুণদোষবিচারক্ষম, বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য শীঘ্র নিশ্চয় করিতে পারগ এবং

* মনু ৭।২০৮

অতীতের কার্য্যাবলীর বিশেষ পরিজ্ঞান যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হয় না।

"সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া॥" ৭।২০৫

এই সংসারে দৈব ও পুরুষকারের উপরেই সকল কর্ম্ম নির্ভর করে। কিন্তু এই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈব অচিন্ত্য। দৈব পূর্ব্বদেহের কর্ম্মফল। কখন সেই ফল ফলিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাই দৈব অচিন্ত্য। অতএব "মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া।" সুতরাং পুরুষকার বলেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে।

হায়! হিন্দু, তুমি কি অদৃষ্টবাদী! যে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র উদাত্তকণ্ঠে এমন মহান্, উদার অনুশাসন বাক্য উদ্ঘোষিত করিয়াছে সেই দেশের লোক কি কেবল অদৃষ্ট মানিয়া জড়পিণ্ড হইতে পারে? ধর্ম্মের অনুশাসন বাক্য না মানিয়া এই দেশের এ দুর্দ্দশা। মনুসংহিতার মত গ্রন্থ বিচারপূর্ব্বক এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কত জন পড়িয়াছেন? পড়িয়া থাকিলেও কেবল বিদেশীর চশ্‌মা দিয়া দেখিয়াছেন, বিচার করিবার অবসর পান নাই। পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই জাতীয় ভাবের উদ্বোধকরূপে শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা হয়। কেবল ভারতেই তাহা নাই। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় মনীষিগণ খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্মের মতগুলিকে জাতীয় জাগরণের উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট। আর ভারতে তদ্বিপরীত। ঐতিহাসিক ধারা সর্ব্বকালে প্রকৃতপন্থা অনুসরণ করেনা। History does not always take the right course." ভগবানের বাণীও নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন,—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ১৮।৪৬

যাঁহা হইতে ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও প্রচেষ্টা, যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, মানুষ স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

অর্থাৎ মনুষ্য নিজ নিজ অধিকারোচিত কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আরও স্পষ্টতর রূপে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥" ১৮।৫৬

যে আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, আমাতে কর্ম্মার্পণ করিতেছে, সে যে কোনও কর্ম্ম করিলেই আমার প্রসাদে শাশ্বত বিষ্ণুপদ লাভ করিবে। কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইলেই কর্ম্মের দোষগুণ থাকে না; চিত্ত শুদ্ধ হয়, জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ হয়। যুদ্ধরূপ কর্ম্মও ভগবৎপ্রীতির জন্য কৃত হউক। তাঁহারই উদ্দেশ্যে কৃত হইলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারে জ্ঞানপ্রাপ্তির সহকারী হইতে পারে। যুদ্ধ ধর্ম্ম; উহা অধর্ম্ম নহে। যুদ্ধ জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক। যুদ্ধ ভগবানের অর্চ্চনা। পররাজ্যের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ধর্ম্ম। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধ আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার বিষয় এখন আলোচিত হইবে।

আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা—রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের তিনটী প্রধান কার্য্য—রক্ষা, শিক্ষা ও বিচার। বস্তুতঃ বিচারও রক্ষার অঙ্গ। এই হিসাবে কার্য্য দুইটী—রক্ষা ও শিক্ষা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা যুদ্ধদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং অন্তঃশত্রু দুর্বৃত্ত প্রভৃতির শাস্তি বিধান করিয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার। বিচারপূর্ব্বক দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার

হইতে রক্ষা করা ধর্ম্ম। শাসনশৃঙ্খলাও রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ ও জাতীয় শক্তি বিবৃদ্ধির উপায়রূপে যুদ্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অন্তঃশত্রুর প্রশাসন সম্বন্ধে সামান্য আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এখন আমরা সবিস্তারে তদ্বিষয় আলোচনা করিব।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় "পিতাহি রাজা রাষ্ট্রস্য" অর্থাৎ রাজা রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। এই মহান্ ভাবের উপরেই অন্তঃশাসন প্রতিষ্ঠিত। মনু প্রভৃতির অনুশাসন বাক্য পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—"পিতাচার্য্যাঃ সুহৃন্মাতা * * *। না দণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি" ইত্যাদি। সকল প্রজায় সমদর্শী হওয়া রাজধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা যম বলিয়াছেন—"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"। রাজাকে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে হইবে। প্রজা রক্ষার জন্যই রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। "যথাশাস্ত্র, যথান্যায় পরিপালন করিলে প্রজার পুণ্যের ষড়্ভাগ রাজা প্রাপ্ত হন এবং প্রজা অরক্ষিত থাকিলে তৎকৃত অধর্ম্মের ষড়্ভাগ রাজার প্রাপ্য।" ইহা মনুবাক্য। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিশদ্ ভাবে বলিয়াছেন—"প্রজা অরক্ষিত হইয়া যে পাপ

অনুষ্ঠান করে, নৃপতি সেই পাপের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন। কারণ, নৃপতি প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন।”* রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্র পরিচালন সম্বন্ধে রাজার ধর্ম্ম ও নৈতিক জ্ঞান কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল। রাজ্যরক্ষার জন্যই রাজার ধন সঞ্চয়। ধনাগারের মালিক রাজা নহেন, ন্যস্ত সম্পত্তির রক্ষক মাত্র। এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। রাজা শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিবেন। এই বিধান দেখিয়াই স্পষ্টতঃ মনে হয়, রাজা ন্যস্ত ধনের রক্ষক মাত্র। ব্যাস বলিয়াছেন—“* * * * নিত্যং কোষঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ। আপদোঽন্যত্র তং কোষং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন।” নিয়ত ধন বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু বিপৎসময় ব্যতীত নিজের ব্যবহারের জন্য ধনাগার হইতে ধন গ্রহণ করিবে না। কর গ্রহণ প্রসঙ্গে ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে তাহা বিবেচিত হওয়া উচিত।

জমির অধিকারী—কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

“ভূস্বামী তু স্মৃতো রাজা নান্যদ্রব্যস্য সর্ব্বদা।
তৎফলস্য হি ষড়্‌ভাগং প্রাপ্নুয়ান্নান্যথৈব তু॥

* অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্‌ গৃহ্ণাত্যসৌ করান্॥

ভূতানাং তন্নিবাসিত্বাৎ স্বামিত্বং তেন কীর্ত্তিতম্।
তৎ ক্রিয়া বলিষড়্ভাগং শুভাশুভনিমিত্তজম্॥"

রাজা ভূস্বামী, কিন্তু অন্য দ্রব্যের স্বামী নহেন অর্থাৎ ভূমিজাত বস্তু সকলের মালিক নহেন। উৎপন্ন দ্রব্যের ষড়্ভাগ রাজার প্রাপ্য; অন্য কিছুই নহে। প্রাণিগণই (প্রজাগণই) ভূমির নিবাসী ও ভূমিতে তাহাদেরই অধিকার। তাহাদের রক্ষক বলিয়াই রাজা স্বামী ও উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশভাক্। ভূমিতে প্রজার অধিকার সম্বন্ধে একটী লৌকিকী গাথা আছে। গাথাটীর মর্ম্ম এই,—"ন মাং মর্ত্ত্যঃ কশ্চন দাতুমর্হতি। ন কশ্চিৎ সার্ব্বভৌমোঽস্তি।" মেধাতিথি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৯৯ তম শ্লোকের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—ভূমি প্রজার। ভূমি সর্ব্বজনোপভোগ্যা। রাজা কেবল রক্ষক। তিনি বলিতেছেন,—"সর্ব্বজনোপভোগ্যা কেবলং রাজানো রক্ষানির্দ্দেশমাত্রভাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় বিধানে প্রজাই ভূমির মালিক। রাজা রক্ষক-রূপে অর্থাৎ গৌণরূপে ভূস্বামী। ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজার। প্রজার শিক্ষা দীক্ষা, অন্তর্ব্বাণিজ্য ও

রাজনীতি।

বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তার, প্রজার সত্ত্বস্বামিত্বরক্ষা, আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা প্রভৃতির জন্য রাজা কর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উৎপীড়ন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। পূর্ব্বেই আমরা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছি। "মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং য ইত্যাদি" এবং "অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ" ইত্যাদি অনুশাসন পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্র বলিতেছেন, ভূমিতে প্রজার অধিকার। ইহাতে রাজার নির্ব্যূঢ় সত্ত্ব নাই। মনু বলিতেছেন,—"স্থানুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্।" যেরূপ যে পশুতে যে শিকারীর অস্ত্রবেধ থাকে সে পশু সেই শিকারীরই প্রাপ্য, সেরূপ যে ব্যক্তি বন কাটিয়া যে ভূমি আবাদ করে সে ভূমি তাহারই প্রাপ্য। ইংলণ্ডে নর্ম্ম্যান্ জাতির অধিকারের ফলে রাজা জমির মালিক হইয়াছিলেন। প্রজা-শক্তির বৃদ্ধিতে এ ভাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ভূমির সত্ত্বে রাজা সত্ত্ববান্ এই ভাব ইংলণ্ডে আজিও কতক পরিমাণে পরিস্ফুট। গণতন্ত্রে জমির মালিক প্রজা। গণ-তন্ত্রে শাসনযন্ত্র প্রজার প্রতিনিধি। যদি কেহ বলেন, জমির মালিক শাসনযন্ত্র, তাহা হইলে আমরা বলিব, গণ-তন্ত্রে শাসন-যন্ত্র প্রজার প্রতিনিধি। এই

হিসাবেও জমির মালিক প্রজা। ইংরাজ ভারতাধিকারে নিব্যূঢ় সত্ত্বে সত্ত্ববান বলিয়া বোধ করেন। ইহার মূলে তাঁহার দেশীয় ভাব। যখন কোন রাজা অন্য দেশ দখল করেন, তখন সেই দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনার অধিকারই রাজা প্রাপ্ত হন। রাজা ভূমির রক্ষক হন, কিন্তু মালিক হইতে পারেন না। ইহাই ভারতীয় বিধান। ইহাতে সবিশেষ সারবত্তা আছে। মেষপালক কখনই মেষের মালিক নহে। রাখাল বালক গরুর মালিক নহে। প্রহরী ধনের মালিক নহে। খোয়াড়ে পশু রাখিয়া আসিলেই খোয়াড়রক্ষক পশুর মালিক হইতে পারে না। ভোগের সত্ত্ব প্রবল, দখলিসত্ত্ব আইনের প্রধান অবলম্বন। দখলিসত্ত্বের মূল ভিত্তি ভোক্তৃত্বে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র "কমলাকান্তের দপ্তরে" রহস্যচ্ছলে যে কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। প্রসন্নগোয়ালিনীকে কমলাকান্ত বলিতেছে,--"গরুর দুধ খাইয়াছি আমি, দধি খাইয়াছি আমি, ছানা খাইয়াছি আমি, মাখন খাইয়াছি আমি, আর গরু হইল তোর?" পালক বা রক্ষক প্রকৃত মালিক নহে। দুই দিন বা পাঁচ দিনের ভোক্তৃত্বের দাবী অবশ্যই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এক রাজা অন্য

রাজাদ্বারা আক্রান্ত হন এবং রাজ্য হারান। এ ক্ষেত্রে শাসনভার হস্তান্তরিত হয়। জমি স্থির জিনিষ, রাজার পরিবর্ত্তন হয়। রাজা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রজায় অনুরঞ্জন করেন যিনি তিনিই রাজা। প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্ম। কিন্তু প্রজার আবাসস্থল ভূমির মালিক রাজা নহেন। প্রজার রক্ষক, মালিক নহেন। সত্ত্বস্বামিত্ব অধিকার প্রভৃতি শব্দে আমরা কি বুঝি? স্ত্রী ও স্বামীর ক্ষেত্রে ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ আছে; কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে দান বিক্রয় করিতে পারেন,—ইহা বোধ হয় কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমোদন করিতে পারেন না। পিতা পুত্র সম্বন্ধও বিচার্য্য। পিতা রক্ষক, পিতা পালক, পিতা উৎপত্তির কারণ। দান, বিক্রয় বা হত্যা করার অধিকার বা সত্ত্ব পিতারও থাকা সঙ্গত নহে। পিতার প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য পুত্র আত্মবলিদান করিতে পারে; পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য বা সমাজের হিত কামনায় পিতা পুত্রকে হস্তান্তরিত করিতে পারেন। দত্তক পুত্র সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে এই ক্ষেত্রে পিতা যে দান করিতেছেন, ইহাতে পুত্রের পুত্রত্ব নষ্ট হইতেছে—

ইহা ঠিক; কিন্তু এই কার্য্য ব্যক্তিগত হিসাবে দুষ্য হইলেও সমাজগত হিসাবে অর্থাৎ পরের মঙ্গলের জন্য দান করাতে দোষযুক্ত হইতে পারে না; বরং উহা করণীয়। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য অনেক সময়ে অন্যায়কেও ন্যায়রূপে বরণ করিতে হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে নানারূপ প্রবঞ্চনা অন্যায় হইলেও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য উহা ন্যায়-ধর্ম্ম রূপে গৃহীত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য—জমির ভাবী মঙ্গলামঙ্গল কি? জমির পালক প্রজা, ফল ভোক্তা প্রজা, সামান্য ভাবে রক্ষকও প্রজা। রাজা ভূমির পালক নহেন, রাজা প্রজার পালক; প্রজাই ভূমির মুখ্যফল ভোক্তা। রাজা প্রজার রক্ষক রূপে গৌণফল ভোক্তা। ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ প্রজার হস্তে, আর প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ রাজার হস্তে। ভূমির উন্নতি অবনতি (মঙ্গলামঙ্গল) প্রজার হস্তে, কারণ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা প্রজার উপর নির্ভর করে। জমিতে বসবাস করে প্রজা; জমির উর্ব্বরতা বিধানের সাহায্য করিতে পারেন রাজা। সেই সাহায্য ভূমিকে গৌণভাবে করা হয়। অতএব ভূমির অধিকারী মুখ্যভাবে প্রজা ও গৌণভাবে রাজা। মুখ্যাধিকারীই প্রকৃত অধিকারী। অতএব প্রজাই

ভূমির অধিকারী। জমিতে প্রজারই নিব্যূঢ় সত্ত্ব, রাজার নহে।

রাজার অধিকার প্রজারক্ষা। রাজা পালক, কিন্তু প্রজার উপর সত্ত্বস্বামিত্ব তাঁহার নাই। রাজা কোনও প্রজাকে দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না। পিতা দত্তক দানে অধিকারী, কিন্তু প্রজার সম্বন্ধে রাজার সেরূপ অধিকার নাই। পিতা পুত্রকে হত্যা করিতে পারেন না, রাজারও সে অধিকার নাই। রাজার প্রজাকে ফাঁসি দিবার অধিকার প্রজার আত্মবলিদানে। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য প্রজা প্রাণ দান করে, ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে। সমাজের কল্যাণের জন্যই রাজা প্রজাকে ফাঁসি দিতে পারেন। রাজার রাজদণ্ড স্থিতির জন্য, ধ্বংসের জন্য নহে। এই দৃষ্টিতে পিতার অধিকার হইতেও রাজার অধিকার নিম্নে।

প্রভু ও ভৃত্যের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। প্রভু ও গোলামের সম্বন্ধ পূর্ব্বে বিচার্য্য। গোলাম সম্বন্ধ কোন রূপেই মানুষের উপযোগী নহে। উহা অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য। ভৃত্য সম্পর্ক সম্বন্ধেও বিচার আবশ্যক। ভৃত্য প্রভুর নিকট ভরণপোষণের দাবী করিতে পারে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা; কিন্তু

ভৃত্যের ব্যক্তিত্বের উপর, ধর্ম্মের উপর প্রভুর কোনও অধিকার নাই; ভৃত্যের রক্ষক প্রভু, কিন্তু ভৃত্যকে হত্যা করিবার অধিকার তাহার নাই। পিতা পুত্রের ধর্ম্মনাশের অধিকারী নহেন। ধর্ম্মই প্রকৃত জীবন। প্রভুও ভৃত্যের ধর্ম্মনাশের অধিকারী নহে। রাজাও প্রজার ধর্ম্মের রক্ষক; কিন্তু রাজা প্রজার ধর্ম্মনাশ করিতে পারেন না। রাজা ধর্ম্মের সংস্থাপকও নহেন। প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক রাজার সহিত হইতে পারে না। সমষ্টির প্রতিনিধিরূপেই রাজা সর্ব্বপূজ্য।

রাজার অধিকার—অতএব দেখিতে পাইলাম ভূমিতে রাজার নির্ব্যূঢ় সত্ত্ব নাই। পিতার যেরূপ পুত্র সম্বন্ধে অধিকার আছে, রাজার সেরূপ অধিকার প্রজার উপর নাই। রাজা প্রজার প্রতিনিধিরূপে প্রাণদণ্ডের অধিকারী। যে ক্ষেত্রে রাজা অথবা শাসন-যন্ত্র সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' করেন, সে ক্ষেত্রেও সাধারণের প্রতিনিধিরূপে রাজা ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া থাকেন। দেশকে পরের হস্তে তুলিয়া দিবার অধিকারও রাজার নাই। রাজা প্রজাকে অপরাধের জন্য ফাঁসি দিতে পারেন; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রাণদণ্ডের অধিকারও তাঁহার নাই।

রাজনীতি।

সমাজের স্থিতিই প্রাণদণ্ডের প্রকৃত অধিকারী। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়াই মানুষ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রতিপালন করে। যাহারা কতকগুলি আইন বা নিয়ম বাঁধিয়া মনে করেন ইহাদের বাঁধনে লোক বাঁধিয়া রাখিতেছি তাঁহারা ভ্রান্ত। মানুষ আত্মদানে এই নিয়মগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। আইনের তাৎপর্য্য গ্রহণে। প্রাণ দিয়া মানুষ যখন আইন গ্রহণ করে, তখনই আইন কার্য্যকরী হয়। প্রাণদণ্ডের নিয়ম যে মানুষ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য সামাজিক মঙ্গলে আত্মবিসর্জ্জন। যে নিয়ম বা আইন মানুষ আপনার বলিয়া—হৃদ্য বলিয়া গ্রহণ করে না, সেই আইন—সেই নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকরী হয় না। "অসি দিয়া হৃদয় জয়" করা যাইতে পারে না। আইনের শৃঙ্খলে মানুষকে বাঁধা যায় না। বাঁধিলেও মানুষের স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহার বিকাশ রুদ্ধ হয়; দাসত্বে মানুষের জীবনের প্রসার হয় না। মানুষের জীবন নিয়মের বাহিরেও। মনুষ্য নিয়ম গড়ে ও ভাঙ্গে, ইহাই মানুষের বিশেষত্ব। কিন্তু প্রাণের নিয়ম, অন্তরের আইন—ধর্ম্মের অনুশাসন, মনুষ্য মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। মানুষ জানে ইহা হইতেই তাহার

বিকাশ সম্ভব। ইহাতেই তাহার উন্নতির সম্ভাবনা। রাজার অধিকার প্রজার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা। রাজা প্রজার সহায়। রাজাই হউক, আর শাসনযন্ত্রই হউক, উহা প্রজার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভাবজগতের কল্পনা-প্রসূত কথা নহে। ইহা বাস্তব জগতের কথা। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেই—কঠোর আইনে প্রজাকে বাঁধিলেই রাজ্য অটুট থাকে না। প্রজার প্রাণেই রাজার রাজসিংহাসন, প্রজার প্রাণেই রাজার আইন, প্রজার প্রাণেই রাজার প্রাণ, প্রজার হৃদয়ই রাজার রাজপ্রাসাদ, প্রজার বাহুই রাজার রক্ষক, প্রজাশক্তিই রাজশক্তি—এই সত্য সর্ব্বদা রাজার স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ধর্ম্মের উপরে যে রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তিই প্রকৃত রাজপদবাচ্য। ইহাই ভারতের সনাতন রাজভাব। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই ভাব অতি মধুররূপে প্রকাশিত। রাজা প্রজা সম্পর্কে ইহা হইতে উচ্চতর ভাব অন্য কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"নিত্যং রাজ্ঞা তথা ভাব্যং গর্ভিণী সহধর্ম্মিণা।
যথা স্বং সুখমুৎসৃজ্য গর্ভস্য সুখমাবহেৎ॥

রাজনীতি।

গর্ভিণী তদ্বদেবেহ ভাব্যং ভূপতিনা সদা।
প্রজাসুখং তু কর্ত্তব্যং সুখমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

গর্ভিণী যেমন নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া গর্ভস্থ শিশুর সুখ বিধান করে, রাজাও সেইরূপ প্রজার সুখের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতেই রাজার সুখ। রাজার নিজের সুখের উদ্দেশ্যেও প্রজার সুখ বিধান কর্ত্তব্য। গর্ভিণী গর্ভস্থ সন্তানের পোষণের জন্য নিজ শরীরের রক্ত মাংস দান করে, নিজের আহারে গর্ভস্থ ভ্রূণকে জীবিত রাখে, নিজের শ্বাস প্রশ্বাসে গর্ভস্থ শিশুকে বাঁচাইয়া রাখে, সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া শিশুর পোষণ ও পালনের জন্য আত্মনিয়োগ করে, শিশুর জন্যই সকল—ইহাই তাহার ব্রত। রাজাও প্রজাসম্বন্ধে এইরূপ ভাবেই পোষণ করিবেন, এইরূপে প্রজাগণকে পালন করিবেন—ইহাই ভারতীয় আদর্শ। ইহা হইতে মনোহর ভাব আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা গণতন্ত্রের আদর্শ কি শ্রেষ্ঠ?

শাসনতন্ত্র—শাসন-যন্ত্র পরিচালন সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তা কিরূপভাবে প্রসারিত হইয়াছিল আমরা এ প্রবন্ধে

তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। মনু বলিতেছেন,—

"অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।

রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥"

অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তির জন্য লিপ্সু হইবে, লব্ধবস্তু যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবে, রক্ষিত বস্তু বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইবে ও সৎপাত্রে দান করিবে। মনু বলিতেছেন, ইহাই রাজার পুরুষার্থ। "এতচ্চতুর্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থপ্রয়োজনম্।" মেধাতিথি এই অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"ন ক্ষত্রিয়ঃ সন্তুষ্টঃ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণবৎ কিন্তু অলব্ধার্জ্জনে যত্নং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকিবে না, কিন্তু অলব্ধ বস্তু উপার্জ্জনের জন্য যত্ন করিবে। "Keep no thought for the morrow"—আগামী কল্যের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিও না—বাইবেলের এই অনুশাসন ক্ষত্রিয়ের জন্য নহে। ক্ষত্রিয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র। তাহাকে 'সংগ্রহ করিও না'—ইহা বলিলে চলিবে না। সংগ্রহ না করিলে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব। খৃষ্টানের পক্ষেও ইউরোপে যিশুর এই উপদেশ কার্য্যকরী হয় নাই এবং হইতেও পারে না। উহা

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সাধারণের নহে। রাজার কার্য্য চারিটী—অর্জ্জন, বর্দ্ধন, রক্ষণ ও দান। রাজ্যের বিস্তৃতি দ্বারা শত্রু হইতে অর্জ্জন করিবেন। অর্জ্জিত বস্তু রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই অবহিত থাকিবেন। সংগৃহীত বস্তুর অপব্যয় না হয় তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। নানা উপায়ে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া নিজের কোষ রক্ষা করিবেন। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে রাজার শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত। সৎসাত্রে দান দ্বারা শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। অর্থ অর্জ্জন ও সংগ্রহ সম্বন্ধে মনুর উপদেশ অতীব মনোজ্ঞ। মনুর মতে অর্থই রাজার ধ্যাতব্য বিষয়। তিনি বলিতেছেন,—"বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্"। সর্ব্বদাই রাজদণ্ড উদ্যত রাখিতে হইবে। নিজের বীরত্বে সকলকে মুগ্ধ করিতে হইবে। নিজের রন্ধ্র সঙ্গোপন ও পররন্ধ্রান্বেষণ করিতে হইবে। রাজদণ্ড উদ্যত রাখিলেও দয়ার সহিত তাহার মিলন আবশ্যক। কেবল উদ্যতদণ্ড হইলেই শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না। রাজদণ্ড স্নিগ্ধ করিবার বিধি মনুতে সুস্পষ্ট,—

"তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সংমতঃ ॥"

কার্য্যানুসারে রাজা তীক্ষ্ণ ও মৃদু হইবেন। তীক্ষ্ণ ও মৃদু হওয়াই সঙ্গত।

নিজের রাজ্যে ছল চাতুরী করা রাজার পক্ষে কখনই শোভন নহে ; কিন্তু পরের ছল চাতুরী বুঝিবার শক্তি তাঁহার থাকা আবশ্যক। শত্রু নানারূপ মায়া অবলম্বন করিতে পারে। তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিচারশীল থাকা একান্ত আবশ্যক। দেশ শাসনে কখন ছল চাতুরী অবলম্বন করিবে না। "অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।" দেশ শাসনে চাতুরী অবলম্বন করা অতীব জঘন্য। যাহারা ছল চাতুরী অবলম্বন করে তাহারা অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বিত হয়। রোমক শাসন প্রণালীর মূলমন্ত্র ছিল—"Divide and rule"—বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসন কর। ইহা ছল চাতুরী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 'কখনও মায়া অবলম্বন করিবে না' "Divide and rule" ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ এই বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসন করার বিরুদ্ধে তৎপ্রণীত Representative Government নামক গ্রন্থে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"It is then interested in keeping up and envenoming their antipathies that they may

be prevented from coalescing, and it may be enabled to use some of them as tools for the enslavement of others. The Austrian court has now for a whole generation made these tactics its principal means of Government, with what fatal success, at the time of Vienna insurrection and the Hungarian contest, the world knows too well. Happily there are now signs that improvement is too far advanced to permit this policy to be any longer successful."

অর্থাৎ উভয় দল মিশিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের ভিতরে শত্রুতার ভাব জাগ্রত রাখা ও বিষময় ভাব বর্দ্ধিত করা ইহাদের কার্য্য। অন্য দলের দাসত্ব বিধানের জন্য এক দলকে যন্ত্ররূপে পরিণত করা হয়। অষ্ট্রীয় রাজ্য বহুদিন হইতে শাসন করিবার জন্য ইহাকেই (Divide and rule policy) প্রধানতম উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার বিষময় ফল জগতের অবিদিত নাই। ভিয়েনার বিদ্রোহে এবং হাঙ্গেরীর বিগ্রহে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুখের বিষয় মানব-

সমাজের এত উন্নতি হইয়াছে যে এই নীতি ফলবতী হইবার আর সুবিধা নাই।

আমাদের মনে হয়, এই কদর্য্য নীতি এখনও পৃথিবীর বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। যে স্থলে প্রবল দুর্ব্বলকে শাসননিগড়ে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী, যে স্থলে ধর্ম্ম বিদলিত, সে স্থলেই জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে, প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রদেশকে উত্তেজিত করিয়া দমন-নীতির বলে দেশ শাসিত হয়। বস্তুতঃ এই নীতি অতীব নিকৃষ্ট ও জঘন্য। ইহার ফলে জাতীয় একতা বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমানের কার্য্যোদ্ধারের জন্য সুবিধা-বাদী (Opportunist) এইরূপ নীতির অনুসরণ করে। কিন্তু ইহার ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। রাজ্যশাসন মহৎ কার্য্য। ইহাতে চালাকী প্রবেশ করিলে শাসনের মহত্ত্ব নষ্ট হয়। লোক শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব আমরা ভারতীয় বিধানের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করি—"অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া"।

মন্ত্রগুপ্তি সর্ব্বদাই আবশ্যক। নিজ মন্ত্রণার বিষয় সংগোপন না করিলে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। রাজার প্রধান অবলম্বন মন্ত্রগুপ্তি।

ইহা বিচার বিভাগের জন্য নহে। শত্রুর জন্যই মন্ত্রগুপ্তি আবশ্যক। মন্ত্রিগণের সহিত গোপনীয় স্থানেই মন্ত্রণা করিবার বিধান। শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ চরদ্বারাই নিষ্পন্ন হইবে। ভণ্ড তপস্বী, নানারূপ বেশধারী লোককে সর্ব্বদা চররূপে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাহারা শত্রুর সংবাদ ও তাহার দেশের অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিবে। "চরৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ"—ইহাই রাজনীতি।

কর্ম্মচারী—কর্ম্মচারী নিয়োগ করা রাজা বা শাসন-যন্ত্রের হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত। গুণাবলী বিচার করিয়াই কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাই, "তেষাং ভাগো বিভাগশ্চ ভবেৎ কর্ম্মানুসারতঃ।" কর্ম্মানুসারেই কর্ম্মচারীদিগের ভাগ বিভাগ। ইহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকিবে। ইনিই স্বরাষ্ট্র সচিব। মনু বলিয়াছেন,—

"তেষাং গ্রাম্যানি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥" ৭।১২০

অর্থাৎ রাজার অন্য সচিব (স্বরাষ্ট্রসচিব) অনলস হইয়া এই কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কর্ম্মচারী

প্রায়শঃ অত্যাচারী ও উৎকোচগ্রাহী হয়। তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর বিধান থাকাই যুক্তিযুক্ত। যাহাদের উপর প্রজার ধন মান প্রভৃতি সকলই নির্ভর করিতেছে, যাহারা রক্ষক, তাহারা ভক্ষক ও অনাচারী হইলে জাতীয় সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। তাহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—

"রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যাভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥ ৭।১২৩
যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্॥" ৭।১২৪

রাজভৃত্য, কর্ম্মচারিবর্গ প্রায়ই পরস্ব গ্রহণশীল এবং বঞ্চক হয়। তাহাদের অত্যাচার হইতে সর্ব্বদাই প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। যাহারা বাদিপ্রতিবাদিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদের সর্ব্বস্ব রাজসরকারে 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।* দার্শনিক বেকন উৎকোচ গ্রহণের জন্য

* "যে রাষ্ট্রাধিকৃতা স্তেষাং চারৈর্জ্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্ রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥" ১।৩৩৮

বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অর্থের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হওয়া কর্ম্মচারীর স্বভাব। ভীষ্মদেবের মত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইয়া বলিয়াছেন,—"অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।" বস্তুতঃ কর্ম্মচারীর অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণ নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি থাকাই বাঞ্ছনীয়। কর্ম্মচারি-নিয়োগ রাজার হস্তে থাকাই বিধেয়। কিন্তু কার্য্যের সমালোচনায় সাধারণের অধিকার থাকিবে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ও কর্ম্মচারিনিয়োগের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"A most important princple of good government in a popular constitution is that no executive functionaries should be appointed by popular election; neither by the votes of the people themselves, nor by those of their representatives. The entire business of government is skilled employment, the qualifications for the dis-charage of it are of the special and profess-

"উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা প্রবাসয়েৎ।
* * * * * * সদা॥" ১।৩৩৯

ional kind which cannot be properly judged of except by persons who have themselves some share of those qualifications, of some practial experience of them."

অর্থাৎ গণতন্ত্রে সুশৃঙ্খল শাসনের একটী প্রধান পন্থা—কর্ম্মচারিনির্ব্বাচনক্ষমতা সাধারণের হস্তে প্রদত্ত না হওয়া। ভোট দিয়াই হউক অথবা প্রতিনিধি দ্বারাই হউক কোনও রূপেই নির্ব্বাচন ভার সাধারণের হস্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে। গভর্ণমেণ্টের প্রধান কার্য্য, কর্ম্মকুশল লোক নিযুক্ত করা। এরূপ কার্য্য-নির্ব্বাহে যেরূপ গুণ আবশ্যক তাহার বিশেষত্ব আছে, অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা আছে। যাহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে তাহাদের বিচার করিবার সামর্থ্য নাই। মিলের মতে সাধারণ-তন্ত্রেও কর্ম্মচারিনিয়োগ গভর্ণ-মেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত থাকা উচিত। ভারতীয় বিধানেও কর্ম্মচারি নিয়োগ রাজার হস্তেই ন্যস্ত। কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ অন্যতম সচিবের কর্ত্তব্য। গরুড় পুরাণে রাজভৃত্য নিয়োগ সম্বন্ধে যে অনুশাসন দেখিতে পাই তাহার অনুবলে রাজকর্ম্মচারি নিয়োগই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বোধ হয়।

"যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
তুলাকষচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকঃ পরীক্ষ্যতে
শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥"

যেরূপ স্বর্ণ পরীক্ষা (চারি প্রকারে) তুলার সাহায্যে, কষ্টিপাথরে, ছেদনে ও অগ্নির তাপে করা হয়, সেইরূপ ভৃত্যের পরীক্ষা বিদ্যাবত্তা, চরিত্র, বংশ ও কর্ম্মকুশলতা দ্বারা সাধিত হয়। এই চারিটীই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মচারি-নিয়োগের প্রধান অবলম্বন। পরীক্ষা দ্বারা কর্ম্মচারি-নিয়োগ শাস্ত্রীয় বিধান; অনুগ্রহ দ্বারা কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা ভারতীয় বিধানে নাই। 'Official hierarchy' স্থাপন করা ভারতের বিধান নহে। পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকায় অনুগ্রহের সম্ভব হয় নাই। Hierarchyও তৈয়ারী হইতে পাবে নাই। কর্ম্মচারিবর্গের উপর কঠোর শাসনের ব্যবস্থা থাকায় কর্ম্মচারিতন্ত্রের (Bureaucracy) সম্ভাবনা ছিলনা। প্রজা সাধারণের হৃদয়ে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, রাজা প্রজার প্রতিভূ বলিয়া কর্ম্মচারি-তন্ত্র ভারতীয় অনুশাসনে স্থান পায় নাই। "ন পরীক্ষ্য মহীপালঃ প্রকর্ত্তুং ভৃত্যমর্হতি।" পরীক্ষা না করিয়া

রাজা কর্ম্মচারী বা ভৃত্য নিয়োগ করিবেন না ইহাই ভারতীয় বিধান। রাজা প্রজার প্রতিভূ হওয়ায় কর্ম্মচারিবর্গও 'গণদাস' (Pubilc scrvant) বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিত।

ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগ—ব্যবস্থা ও বিচার সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শের আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে প্রাকৃত লোকের এক কাহন অর্থদণ্ড হয়, সেই ক্ষেত্রে রাজার সহস্রগুণ দণ্ড হইবে—ইহাই ভারতীয় আদর্শ। "প্রাপ্তকালং যথা দণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি" ইহাই ভারতীয় ন্যায়ের মর্য্যাদার মেরুদণ্ড। "নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি"—ইহাতেই ভারতীয় বিচারধারা প্রতিষ্ঠিত। ভারতে ব্যবহার বা বিচার বিভাগে বাদী ও প্রতিবাদীর কোনও খরচ বহন করিবার বিধান নাই। রাজা প্রজার নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন সেই কর গ্রহণ করার জন্যই রাজা প্রজার বিচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। অভিযোগ করার জন্য কোর্টফি (Court fee) দিতে হইত না। ষ্ট্যাম্প্ আইন অনুবলেও অর্থব্যয় ছিল না। বিচার শাসনেরই অঙ্গ। বিচারের জন্য প্রজাকে করভারে প্রপীড়িত করা অসঙ্গত।

এই জন্যই মনু বলিয়াছেন,—"যে সকল পাপচেতা বাদী ও প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদের সর্ব্বস্ব 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবে।" রাজা প্রজার নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন, তাহার জন্যই রাজাকে বিচার করিতে হয়। অতিরিক্ত কর আদায় ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যেমন রাজধর্ম্ম, দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করাও তেমনই রাজধর্ম্ম। জমির স্বত্ত্ব সাব্যস্ত করাও রাজধর্ম্ম। রক্ষার জন্যই বিচার আবশ্যক। ব্যক্তিগত স্বত্ত্বস্বামিত্ব নির্দ্ধারণ, প্রবল ও দুর্ব্বলের দ্বন্দ্বের মীমাংসা প্রভৃতিই বিচারের তাৎপর্য্য। প্রজা রক্ষা করিতে হইলেই এই সকল একান্ত আবশ্যক। অতএব বিচার প্রভৃতির জন্য রাজা অতিরিক্ত কর স্থাপন করিতে পারেন না—ইহাই ভারতীয় বিধান। বিচার প্রভৃতি করিবার জন্যই কর প্রদত্ত হয়। এরূপ অবস্থায় অতিরিক্ত কর স্থাপন করা অসঙ্গত ও গর্হিত। বিচারের নিদর্শন স্বরূপ একটী প্রথার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা হইতে ভারতীয় ন্যায়ের আদর্শ বিশেষ পরিস্ফুট হইবে। চোর কাহারও ধন অপহরণ

করিলে রাজা নিজের ধনাগার হইতে সেই ব্যক্তিকে ধন প্রদান করিবেন। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাই,—

"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং চৌরৈরপহৃতং ধনম্।
তৎপ্রমাণং স্বকাৎ কোষাদ্দাতব্যমবিচারয়ন্॥
ততস্তু পশ্চাৎ কর্ত্তব্যং চৌরান্বেষণমঞ্জসা।
চৌররক্ষাধিকারিভ্যো রাজাঽপি তদেবাপ্নুয়াৎ॥
আহৃতে চ তথা বিত্তে হৃতমিত্যেব বেদিনম্।
নির্দ্ধনং পার্থিবঃ কৃত্বা বিষয়াৎ স্বাদ্বিবাসয়েৎ॥"

সকল বর্ণকেই চৌরাপহৃত ধনের পরিমাণ ধন, নিজের ধনাগার হইতে কোনও বিচার করিবার পূর্ব্বেই দান করিবে। তৎপরে চোরের অন্বেষণ করিবে। চৌর্য্য নিবারণের জন্য যাহারা নিয়োজিত (Police) তাহাদের নিকট হইতে 'জরিমানা' আদায় করিয়া রাজকোষ হইতে প্রদত্ত ধনের পরিমাণ অর্থ আদায় করিবে। আর যদি অপহৃত ধন পাইয়াও 'পুলিশ' গোপন করে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যেও

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।* কিন্তু কোনও ব্যক্তির নিজ ভৃত্য কোনও বস্তু চুরি করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে না। রাজা ভৃত্যকে শাসন করিবেন। "Prevention is better than cure" রোগের প্রতীকার করা অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই সঙ্গত। চুরি হইতে দিয়া তৎ সংশোধনের প্রচেষ্টায় লাভ কম। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হয়। অপরাধ যত কম হয় ততই মঙ্গল। অনেক ক্ষেত্রে 'পুলিশ' উৎকোচগ্রাহী হইয়াই চোর, ডাকাত ও বদ্‌মায়েস প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেয়। ইহা নিবারণ করিতে হইলে তাহাদের শাসন আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত 'পুলিশ' শাসনের অপব্যবহার। 'পুলিশের' শাসন ও শোষণ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা রক্ষক তাহারা ভক্ষক হইলে সামাজিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। 'পুলিশ' সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্যই যাহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় এরূপ নিয়মের আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে আমরা

* দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায়তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ॥
—যাজ্ঞবল্ক্য।

দার্শনিকতারই পক্ষ সমর্থন করি। 'পুলিশের' নিকট হইতে অপহৃত ধন আদায় করাই যুক্তিযুক্ত। 'পুলিশের' হস্তে শাসনযন্ত্রের অপব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশী। যখন কোনও শাসনতন্ত্র 'পুলিশ' দ্বারা (Police rule) পরিচালিত হয় তখনই মনে করিতে হইবে শাসন-যন্ত্র শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। 'পুলিশের' হস্তে শাসনের কল্ কব্জা ছাড়িয়া দিবার মত রাজনীতিতে অন্য কোনও গুরুতর ভ্রম হইতে পারে না। "Administration by police is the grandest of all political failures" শাসনযন্ত্র যখন নৈতিক বলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন ইহার গতি শ্লথ ও মন্থর হয়, যখন লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়, তখনই শাসনযন্ত্র 'পুলিশের' হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে; ইহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, সবলতার লক্ষণ নহে। বিচার করিবার সময় রাজা ও ধর্ম্মাধিকরণের বিনীত বেশাভরণ হওয়া উচিত। যেরূপ পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিলে লোকের ভয় অথবা বিরাগ জন্মে সেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে বিচার কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে না। মনু বলিতেছেন,—

"বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্"। বিচারের সময় তিন জন সভ্যকে সঙ্গে লইয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। মনু বলিতেছেন,—

"সোঽস্য কার্য্যাণি সংপশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।" এই সভ্যগণই জুরির (Jury) কার্য্য করিত। জুরি প্রথা ভারতীয় বিধানে সুপরিস্ফুট।

আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও মহান্ ও উদার মত মনু-সংহিতায় দেখিতে পাই। এই উদার ভাব বস্তুতঃই ভক্তির উদ্রেক করে। মনু বলিতেছেন,—

"জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ।"

প্রত্যেক জাতীয় ধর্ম্ম, প্রত্যেক জনপদের বিশেষ ধর্ম্ম, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ ধর্ম্ম ও প্রত্যেক কুলের বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত করিবে। ইহা হইতে মহত্তর অনুশাসন আর কি হইতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াই আইন সার্থক। ব্যক্তির বিকাশ যে আইনে রুদ্ধ হয়, সেই আইন কলঙ্কস্বরূপ। সমষ্টির বিকাশ যেমন আইনের তাৎপর্য্য, ব্যক্তির বিকাশও তেমনই আইনের

তাৎপর্য্য। আইন ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত না হইলে সেই আইনে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। ধর্ম্মের ভিত্তিতেই আইন গঠিত হওয়া সঙ্গত।

ভারতে ধর্ম্মের—আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা পাপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভারতের একটী উপাখ্যান উল্লিখিত হইল—কোনও তাপস ব্রাহ্মণ তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তপোবনে গমন করিলেন। ভ্রাতাও তপস্বী। তিনি তখন তপোবনে ছিলেন না। বেলা অধিক হইল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, তথাপি ভ্রাতা ফিরিলেন না। তখন ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বৃক্ষ হইতে ফল আনয়ন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। ইত্যবসরে জ্যৈষ্ঠভ্রাতা আসিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পরে আহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন তপোবনের ফল খাইয়াছেন। তখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিলেন, "তোমার অপরাধ হইয়াছে। তুমি ব্রাহ্মণ ও তাপস। চুরির জন্য তোমার পাপ হইয়াছে। অতএব রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিজের দোষ খ্যাপন ও শাস্তি গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, নিজ দোষ খ্যাপনপূর্ব্বক শাস্তি প্রার্থনা করিলেন।

রাজা নানারূপ আপত্তি করিলেন; “আপনি তাপস, আপনাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার নাই।” এই প্রকার নানারূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারাও ব্রাহ্মণকে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ, স্থিতি রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমার দণ্ড বিধান করুন।” রাজাও ব্রাহ্মণের বাক্য যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। ইহা যে দেশের আদর্শ, যে দেশে অপরাধী অপরাধ করিয়া শাস্তি লইবার জন্য অগ্রসর, যে দেশে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আনন্দে বরণ করে, যে দেশের লোক রাজদণ্ডকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করে, সেই দেশ সম্বন্ধে মিল্ তাঁহার ‘Representative Government’ নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। মিল্ এ দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন ও বিলাতি কর্ম্মচারি-বর্গের আরোপিত কলঙ্ককাহিনী শুনিয়াই তিনি এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ ও ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

“A people who are more disposed to shelter a criminal than to apprehend him,

who like the Hindoos, will perjure themselves to screen the man who has robbed them, rather than take trouble or expose themselves to vindictiveness by giving evidence against him, require that the public authorities should be armed with much sterner powers of repression than elsewhere since the first indispensable requisites of civilized life have nothing else to rest on."

—Mill's Representative Government.

অর্থাৎ যে জাতি অপরাধীকে ধৃত না করিয়া তাহাকে লুকাইয়া রাখে, যাহারা হিন্দুদের ন্যায় অপরাধী দস্যুকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে,—এমন কি সাক্ষ্য প্রদানের পরিশ্রম স্বীকার করিতেও নারাজ অথবা প্রতিহিংসার ভয়ে ভীত, সেই দেশে সরকারের দমননীতির অসীম ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। কারণ সভ্যতা ইহা ব্যতীত অন্য কিছুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই মতবাদ মিলের ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। অনেক পরিমাণে ইহা সঙ্কীর্ণতারও জ্ঞাপক।

ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবেই মিল্ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মিলের দার্শনিকতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মিল্ তাঁহার মতের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। দার্শনিক্ দৃষ্টির অভাবও এইরূপ মতবাদের কারণ। যে দেশের অনুশাসনে সুবর্ণচোর নিজের দোষ খ্যাপন করিতে করিতে রাজসান্নিধ্যে গমন করিবে—এইরূপ বিধি রহিয়াছে, সে দেশ সম্বন্ধে, সে জাতি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য কখনই শোভন হইতে পারে না। মনু-সংহিতায় দেখিতে পাই,—

"রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষণেন তৎ স্তেয়মেবং কর্ম্মাস্মি শাধি মাম্॥" ৮।৩১৪

অর্থাৎ সুবর্ণাপহারী মুক্তকেশে নিজের দোষ খ্যাপন পূর্ব্বক—আমি চুরি করিয়াছি, আমাকে শাস্তি দিন—এরূপ বলিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইবে। আমরা ফলাপহারী তাপস ব্রাহ্মণকেও 'শাধি মাম্' এই ' বলিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। মনু এ প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন,—

"স্কন্ধেনাদায় মুসলং লগুড়ং বাপি খাদিরম্।
শক্তিং চোভয়তস্তীক্ষ্ণামায়সং দণ্ডমেববা।" ৮।১৩৫

চোর নিজেই তাহার শাসনের জন্য স্কন্ধে মুসল, লগুড়, উভয় পার্শ্বে ধারাল শক্তি অথবা লৌহদণ্ড লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইবে। রাজার দণ্ডপ্রদানেই সে পাপ মুক্ত হইবে। "শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বাস্তেন স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।" শাসনে অথবা রাজা মুক্তি দিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে দেশের ধর্ম্মের অনুশাসনে এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধান, যে দেশের লোক আজও চান্দ্রায়ণাদি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করে,সেই দেশের লোক সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ অশোভন হইতেও অশোভন। প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে গ্রীক্ গ্রন্থকার এরিয়ান্ বলিয়াছেন—"No Indian could be accused of lying." কোনও ভারতবাসীকে মিথ্যা কথনের অপরাধে অপরাধী করা যায় না। প্রাচীন ভারতের সত্যবাক্য ব্যবহার সম্বন্ধে Max Muller তৎপ্রণীত 'India—what can it teach us' নামক গ্রন্থে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। ঐতিহাসিক Vincent A. Smith ও লিখিয়াছেন—

"It is certainly the fact that the people of ancient India enjoyed a wide-spread and enviable reputation for straight-forwardness and honesty."

ভারতীয় হিন্দুগণের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় একটী ঐতিহাসিক সত্যের বিষয় অবধারণ করা একান্ত যুক্তিযুক্ত। মুসলমান শাসনের সময় কাজির বিচার (Justice's justice) একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির বিবরণে, সার ইলাইজা ইম্পের বিচার প্রহসনে দেশবাসী বিদেশীর বিচার সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে শিখিয়াছে। ইহা অনেকটা স্বাভাবিক। আর বিলাতের রাজপুরুষগণ আপনাদের অব্যাহত শক্তির অপব্যবহারের জন্য মিথ্যা রটনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মিল্ তাহাদের কথা শুনিয়াই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের কথা বাদ দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বিজাতীয় শিক্ষার ফলে এদেশের চরিত্র অধিকতর কলুষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মিথ্যা সত্যের আবরণে, কুটিলতা সরলতার আবরণে, 'ভণ্ডামি' ধর্ম্মের

আবরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা আদৌ ভারতীয় ভাব নহে। উহা ভারতীয় ভাবের সহিত বিদেশীয় ভাবের সংমিশ্রণের ফল।

ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃই ভারতীয় জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে; অন্যথা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌দের মত ধ্বংস প্রাপ্ত হইত কিনা কে বলিতে পারে? এই সম্বন্ধে একটী ঘটনা মনে পড়িল,—মায়াবতীতে (Almora) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'পুলিশ' বসে। ইহার পূর্ব্বে 'পুলিশের' ব্যবস্থা ছিল না। কোনও ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া ৮০০ টাকা চুরি করিয়াছিল। হাকিম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "হাঁ, আমি চুরি করিয়াছি, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া আমি এরূপ করিয়াছি, টাকা অমুক জায়গায় রাখিয়া দিয়াছি। চুরি করিয়াছি বলিয়া কি মিথ্যা কথা কহিব।" যে দেশের সাধারণ লোকের এইরূপ উক্তি, সে দেশের লোক সম্বন্ধে মিলের এইরূপ মত প্রকাশ করা যে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ম্মচারীর বেতন—ভারতীয় বিধানে রাজকোষ হইতে রাজকর্ম্মচারিবর্গের বেতন প্রদত্ত হইত।

গ্রামাধ্যক্ষ, দশাধ্যক্ষ, শতাধ্যক্ষ, সহস্রাধ্যক্ষ—সকল রাজকর্ম্মচারীই রাজার নিকট হইতে বেতন পাইত। সামান্য গ্রাম্য প্রহরী হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারীর বেতন রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইত। এজন্য অতিরিক্ত কর প্রজাগণকে দিতে হইত না। গ্রাম রক্ষাও রাজাই করিবেন। চৌকিদার প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া অতিরিক্ত করগ্রহণ ভারতীয় বিধি নহে। গ্রাম রক্ষকও রাজকোষ হইতে বেতন পাইত।

চর নিয়োগ—কর্ম্মচারী সমূহের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য চর নিযুক্ত করিবার বিধান আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পক্ষান্তরে এই চর সমূহের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও বিশেষ তদন্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, "প্রণিধানাংশ্চ চেষ্টিতম্"—চরগণের কার্য্যাবলীরও অনুসন্ধান করিবে। একজন চরের কার্য্য দেখিবার জন্য অন্য চরকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাজা স্বয়ং তদ্বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহাদের বাক্যের সত্য-মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিয়া যথাবিহিত কার্য্য করিবেন। চরগণ অনেকক্ষেত্রে মিথ্যা সংবাদ বহন করে। তাহাদের বাক্যের মূল্য নির্ণয় করিতে রাজাকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চরিত্রহীন

ব্যক্তি চরের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অনেক সময় তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধেও খরদৃষ্টি প্রয়োজন।

জনহিতকর কার্য্য—অন্ন দান, ঔষধ দান রাজধর্ম্ম। পান্থশালা, অতিথিশালা, দাতব্য ঔষধালয়, পশু-চিকিৎসালয়, রাস্তা, ঘাট, চৈত্য, মন্দির প্রভৃতি স্থাপন রাজার কর্ত্তব্য। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা রাজাকেই করিতে হইবে। শঙ্খ লিখিত বলিয়াছেন,—"কৃপণাতুরানাথব্যঙ্গবিধবাবালবৃদ্ধানৌষধাবসথাসমাচ্ছাদানৈর্বিভৃয়াৎ"—দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, অনাথ, অঙ্গহীন, বিধবা, বালক ও বৃদ্ধগণকে ঔষধ, বাসস্থান, শয্যা ও আচ্ছাদন প্রভৃতি ও অন্ন প্রদানে রক্ষা করিবে। ইহা রাজধর্ম্ম। বশিষ্ঠও বলিয়াছেন,—"ক্লীবোন্মত্তান্ রাজা বিভৃয়াৎ"—ক্লীব ও উন্মত্ত প্রভৃতিকে রাজা অন্ন প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভরণ পোষণ করিবেন। আপস্তম্ব অতিথিশালায় অতিথিগণকে সৎকার পূর্ব্বক রাখিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং অগ্রে গুরু ও অমাত্যবর্গের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া পশ্চাৎ নিজের জীবিকার বন্দোবস্ত করিবার বিধান দিয়াছেন। মনু বেদপারগ ব্রাহ্মণ, ব্যাধিত, আর্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন

প্রভৃতি প্রদানে "সম্পূজয়েৎ সদা"—এই বিধান দিয়াছেন। শঙ্খ লিখিতের ব্যবস্থায় দেখিতে পাই—যে সকল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ তাহাদিগকে সাহায্য করা রাজধর্ম্ম এবং "শিল্পিনঃ কারবশ্চ শূদ্রাঃ" আপনাদের জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ হইলে রাজাই তাহাদের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদীরা যে শ্রমজীবিগণের জন্য ব্যস্ত, তাহারা ভারতীয় বিধানে শাসনতন্ত্রে সমান অধিকারী। তাঁহাদের প্রতি রাজার কর্ত্তব্যও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের তুল্য। ভারতীয় বিধানের ইহাই বিশেষত্ব।

লোকের প্রতি ব্যবহার—লোকের সহিত ব্যবহারে সৌজন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যবহারের মধুরতায় জনপ্রিয় হওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-স্বভাব এবং ক্ষত্রিয়-স্বভাব লোকের বাক্যের তীক্ষ্ণতা থাকিবে কিন্তু হৃদয় অত্যন্ত কোমল হইবে। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় স্বভাবাপন্ন লোক তদ্বিপরীত। ক্ষত্রিয়ের বাক্য সুমধুর কিন্তু হৃদয় পাষাণবৎ সুদৃঢ়। ব্রাহ্মণ তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণ-স্বভাব লোকের ধর্ম্ম। কিন্তু শরীরাদিতে অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি

ব্রাহ্মণ সহ্য করিতে পারেন না। ক্ষত্রিয়-স্বভাব ব্যক্তি অস্ত্রঘাতাদিজনিত দুঃখসহিষ্ণু, কিন্তু তপস্যাদির ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না। রাজা ক্ষত্রিয়-স্বভাব, সুতরাং বাক্যের ও ব্যবহারের মাধুর্য্য তাঁহার স্বাভাবিক। রাজ-ব্যবহার অত্যন্ত মধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ।"
"বধ্যেষ্বপি ন ভ্রূকুটীমাচরেৎ॥ *

অর্থাৎ সকলের সহিত হাসিমুখে কথা কহিবে। মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিও ভ্রূকুটী করিবে না। যাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া ক্রোধে আত্মহারা হন এবং যাঁহারা শাসনকর্ত্তারূপে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জনসাধারণকে তীব্র গালি দেন, তাঁহাদের এই অনুশাসন দুইটী স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ আচরণ অত্যন্ত বিগর্হিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত মদালসার উপাখ্যানে রাজাকে কোকিলের ন্যায় মধুরভাষী হইতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "কাককোকিলভৃঙ্গানাং * * শিক্ষেত চরিতং নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা কাকের ন্যায় চতুর, কোকিলের

* বিষ্ণুসংহিতা॥ ৬৩।৬৪

ন্যায় মধুরভাষী ও ভৃঙ্গের ন্যায় অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইবেন। মধুরভাষী লোক সকলের প্রিয় হয়। পরুষভাষী লোক কখনও জনপ্রিয় হইতে পারে না। "ন কাংশ্চিন্মর্ম্মাণি স্পৃশেৎ" অর্থাৎ কাহাকেও মর্ম্মস্পর্শী বাক্য বলিবে না—এই অনুশাসন সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশও মধুরভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টি ও বাক্যের ক্রূরতা অসহনীয়। বিনীত ব্যবহারে সকলেই প্রীত হয়। কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা অধর্ম্ম।

দণ্ড বা শাস্তিপ্রদান—অপরাধীর শাস্তিবিধান রাজধর্ম্ম। নির্দ্দোষের দণ্ডপ্রদান অধর্ম্ম। অল্পাপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অত্যন্ত গর্হিত। শাস্তির উদ্দেশ্য সমাজরক্ষা ও ব্যক্তির সংশোধন। ব্যক্তির জীবনবিকাশ প্রাকৃতিক নিয়ম। অপরাধীও যাহাতে চরিত্র সংশোধন করিয়া উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কঠোর শাস্তিবিধানে সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যেমন স্বাভাবিক, কঠোর শাস্তিতেও প্রতিক্রিয়া সেইরূপ স্বাভাবিক। অতিরিক্ত কঠোরতায় ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করাও সুকঠিন হইয়া পড়ে। যে-উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদান

করা হয়, তাহা সফল না হইয়া বিপরীত ফল প্রসব করে। দশ জন অপরাধী মুক্তিলাভ করুক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষও যেন দণ্ডিত না হয়, এই ভাবটী অতি সুন্দর। অদণ্ড্য ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ পরিপূর্ণ অধর্ম্ম। আইনের ব্যবহার ক্ষেত্রে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়ে শাসনের ভীষণতা দেখাইবার জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, ইহার ন্যায় গর্হিত অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহা দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। য়িহুদী দেশে 'হিরদ' ভাবী আশঙ্কায় যেরূপ ভাবে বালক হত্যা করিয়াছে, রোমসম্রাট্ 'নীরো' অধর্ম্মের আতঙ্কে যেরূপ অমানুষিক বর্ব্বরতা প্রদর্শন করিয়াছে, ইংলণ্ডের রাণী 'মেরী' যেরূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছে, স্পেনীয় Inquisitionএ রাজশাসনের যেরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, সেরূপ অধর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। ভারতে কংসের অত্যাচারের ফল তাহার নিধন; জরাসন্ধের অত্যাচার তাহার প্রাণাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার সহিত নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন,—

"অধর্ম্ম-দণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যং চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" ৮।১২৭

অধর্ম্ম পূর্ব্বক—অন্যায় পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তিনাশ হয় এবং পরলোকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিবে।

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।"
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈবগচ্ছতি॥" ৮।১২৮

অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে ও প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড না দিলে অযশ হয় ও নরকপ্রাপ্তি ঘটে। 'অধর্ম্ম-দণ্ডনং' এই বাক্যের অর্থ,—ধর্ম্মশাস্ত্র না মানিয়া কেবল রাজার ইচ্ছায় অথবা রাজদ্বেষবশে শাস্তি প্রদান করা।

ভারতে রাজার আইন প্রণয়নে অধিকার ছিল না। সনাতন বিধান ঋষিগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রজার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণগণ সেই সকল বিধানের মীমাংসা করিতেন; কেবল প্রয়োগ করিবার ভার রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজার অপব্যবহারই অধর্ম্ম-দণ্ড। এইরূপ বিধান থাকাতেই রাজাও ধর্ম্মের (আইনের) অধীন। সনাতন বিধান মানিতে রাজা বাধ্য। ব্রাহ্মণগণের মীমাংসা গ্রহণও রাজার কর্ত্তব্য। এইরূপ ধর্ম্মবিধান থাকাতেই রাজা অপক্ষপাত বিচার

করিতেন ও তাহাতে অবিচার নিবারিত হইত। মর্য্যাদা (Prestige) রক্ষা করিতে গিয়া শাস্তি দেওয়া অধর্ম্ম-দণ্ড। ধর্ম্মাধিকরণের পক্ষপাতিত্বও দোষাহ। "স্থিত্যৈঃ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্" ইহা মূলমন্ত্র না হইলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা না থাকিলে, সেই দণ্ড প্রদান অধর্ম্ম। 'বদমায়েসি মোকদ্দমায়' যেরূপ বিচারের অভিনয় হয়, তাহা দেখিলে মনে হয়, ইহা বিচার নহে, অত্যাচার। শাসনযন্ত্রের একটী মহান্ দোষ এই যে, যাহারা রক্ষার জন্য নিয়োজিত তাহারা অনেক ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। অনেক সময়ে প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আইনকীট বা গ্রন্থকীট মাত্রই হইয়া থাকে, আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। বিচারকও অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিচার প্রহসনের সৃষ্টি করেন। বিচারাসনে বসিতে হইলে দার্শনিকতা ও অন্তর্দ্দৃষ্টি আবশ্যক। ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করিতে দার্শনিকতার একান্ত প্রয়োজন। আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া নির্য্যাতনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। এরূপ বিচারকের নিকট জীবনের যে একটা মূল্য আছে তাহা প্রতিভাত হয় না। গম্ভীর-

বেদী বিচারক আইনের বাহাদুরী করিতে পারে, কিন্তু তাহার হস্তিমূর্খতা সুস্পষ্ট। এইরূপ বিচারবিভ্রাটে সমাজের অমঙ্গল অনিবার্য্য। শাস্তি প্রদান সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন শিরোধার্য্য। তিনি বলিতেছেন—

"অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌচালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥৮।১২৬

অনুবন্ধ, দেশকাল তত্ত্বতঃ জানিয়া, যাহাকে শাস্তি দিতে হইবে তাহার চিত্তের সামর্থ্যাদি ও অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিশেষ বিবেচনা করিয়া শাস্তি প্রদান করিবে। দণ্ডপ্রদান সম্বন্ধে এইটী মাতৃকাশ্লোক—ইহার উপরেই দণ্ডপ্রদানের ভিত্তি। এস্থলে 'অনুবন্ধ' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। অনুবন্ধ শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ অপরাধে প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তির কারণ; কি উদ্দেশ্যে অপরাধী এই কার্য্য করিয়াছে—যথা, নিজের পরিবারবর্গকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া, অথবা ধর্ম্মের জন্য, অথবা দলে পড়িয়া অথবা জুয়া প্রভৃতি খেলিয়া তাহাতে হারিয়াছে বলিয়া, অথবা প্রমাদ বশে, অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক, পরপ্রযুক্ত হইয়া, বা স্বেচ্ছায়—ইহাই অনুবন্ধ। অনুবন্ধ নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, কিন্তু ইহা নির্দ্ধারণ ব্যতীত বিচার অসম্ভব।

দেশ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কিরূপ স্থানে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষাদি সময়ে অথবা বাল্যকালে কিম্বা যৌবনকালে—ইহার নিরূপণই কালের নিরূপণ। 'সার' শব্দের অর্থ অপরাধকারীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি। তত্ত্বতঃ জানা ও সামান্যরূপে জানায় অনেক 'তফাৎ'। তত্ত্বতঃ শব্দটীর ভিতরে অনন্তভাব নিহিত আছে। স্বরূপতঃ জানা, যথার্থরূপে জানাই তত্ত্বতঃ জানা। 'আলোক্য' শব্দটীর প্রয়োগও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসমন্তাৎ লোকন—দর্শনই অলোক্য শব্দের অর্থ। সম্যগ্‌রূপে দর্শনই আলোকন। অতএব শাস্তি প্রদানের সময় সকল দিক্ দেখিয়া, সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া দার্শনিক দৃষ্টির অনুবলে দণ্ডপ্রদান বিধেয়। দণ্ড প্রদানের কঠোরতা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া শাস্তি প্রদান অধর্ম্ম। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের তাৎপর্য্যও ব্যক্তিত্বের প্রসারে, সঙ্কোচে নহে। মৃত্যু-দণ্ডকালে ব্যক্তি আপনার পাপজীবনের অসারতা বুঝিতে পারিয়া, নবজীবনের জন্য, অনন্ত আশায় নবভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। জীবের নিকট জীবন প্রিয়, কিন্তু দুর্ব্বিষহ পাপজীবন হইতে অনন্ত

আশাপূর্ণ নবজীবন লাভের জন্য মৃত্যুকে সে বরণ করিতে পারে। এরূপ নবজীবনের আশা না থাকিলে তাহার ব্যর্থজীবনের ভারে সে অবশ্যই প্রপীড়িত হইবে। কেবল দণ্ড দেওয়াই তাৎপর্য্য নহে। কেবল শৃঙ্খলা রক্ষাই তাৎপর্য্য নহে। ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তিও দণ্ডপ্রদানের তাৎপর্য্য। এই দৃষ্টি না থাকিলে বিচারক বিচারাসনের কলঙ্ক এবং যে আইনে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেই আইন আইন নামের অপব্যবহার মাত্র। প্রথম অপরাধ সামান্য হইলে তাহাকে 'জেলের' কঠোর শাসন প্রদান অতীব গর্হিত; কারণ, 'জেল'খানা সংশোধনের স্থান না হইয়া অবিশুদ্ধির স্থান হয়। (Jail is more or less not a place of correction but a place of corruption.) অনেক সময় প্রথমাপরাধী 'জেল'-খানার 'আব্‌হাওয়ায় 'পাকা' হইয়া আসে। দুর্ব্বৃত্তের সংসর্গের ফল অবশ্যই ফলিবে; বিশেষতঃ প্রথমাপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হইলে, সেই অনুশোচনার ফলে পরিবর্ত্তনও সাধিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে 'জেল'খানার অপবিত্র সংসর্গ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। 'জেল'খানা হইতে একবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর চরিত্র সংশোধনের পথ থাকে না। সমাজে হেয় হইয়া, নিজের

দুঃসহ জীবনভার বহন করিতে করিতে, কাহারও সহিত মিলিতে মিশিতে না পারিয়া, সে দুষ্টপ্রকৃতি লোকের সহিত মিশিতে থাকে ; কারণ নিরাশ্রয় হইয়া সে আশ্রয় খুঁজিবেই। এইরূপে তাহার জীবনটী সমাজের পক্ষে কণ্টক স্বরূপ হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, প্রথম অপরাধীকে এরূপ দণ্ড দিলে তাহার জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ভারতীয় বিধানে করুণা আছে, উদারতা আছে, সর্ব্বোপরি দার্শনিকতা আছে। সমপ্রাণতার ভাবটীও সবিশেষ পরিস্ফুট। মনু বলিতেছেন,—

"বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্‌।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্‌॥ ৮।১২৯
বধেনাপি যদাত্বেতান্নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্ব্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্‌॥" ৮।১৩০

প্রথম অপরাধে কেবল তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিবে ও পুনরায় এরূপ করিতে নিষেধ করিবে। ইহার পরে অপরাধ করিলে "ধিক্‌ ধিক্‌" ইত্যাদি পরুষ বাক্যে নিন্দা করিবে ও লোকের নিকট অবমানিত করিবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে ধন দণ্ড বা 'জরিমানা' করিবে। তাহাতেও চরিত্র শুদ্ধ না হইলে শারীরিক

দণ্ড প্রদান করিবে। যখন শারীরিক দণ্ডে নিগ্রহ করিলেও সংশোধিত না হইবে তখন সকল প্রকার দণ্ডই বিহিত হইবে।

এই অনুশাসনে সংশোধনের চেষ্টা আছে; মনুষ্য-জীবনের মূল্য স্বীকৃত, ব্যক্তিত্বের প্রসারের চেষ্টা পরিস্ফুট, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানের সত্য প্রতিফলিত, লোক স্থিতির প্রয়াস পরিলক্ষিত, সর্ব্বোপরি করুণা ও ন্যায় ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলনের মনোহর চিত্র সমুদ্ভাসিত। শাস্তি প্রয়োগের মূলে দার্শনিকের অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রয়োজন। শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু শাস্তি প্রদানের বাড়াবাড়ি ও অপব্যবহার কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শাসনকর্ত্তার অন্তর্দ্দৃষ্টি থাকিলে তাহার অধিকারে বিচার প্রহসন্ হইবার সম্ভাবনা কম। ব্যবস্থাগুলিও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। শাসনপ্রসঙ্গে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে রাজা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া উচিত। "A prince can never govern well unless he is participant in the ideas." * তাঁহার এই মত জর্ম্মন্ দার্শনিক

* এই বাক্য Kant's 'Critique of Pure Reason' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

Kant এর 'Critique of Pure Reason' নামক গ্রন্থে সাধারণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'Ideas' বা আত্মজ্ঞানে যে জ্ঞানী নহে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয় সুশাসন অসম্ভব, ইহাই প্লেটোর অভিমত। বাস্তবিক পক্ষে শাসন ব্যাপারেও দার্শনিক দৃষ্টি আবশ্যক। মানসিক ধারা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়; বিশেষতঃ অন্তর্নিহিত ভগবৎ সত্তার ধারণা ও বহির্জ্জগতের ক্ষণিকত্ব ও অসারত্ব বোধ রাজার পক্ষে শোভন ব্যতীত অশোভন নহে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ রাজার পক্ষে আশ্রয়ণীয়। অখণ্ড আত্মবোধ, ন্যায় ও ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। ইহাতেই সর্ব্বকার্য্যের প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব গতির পরিণতি। ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ শাসন করিবার মূলে অখণ্ড আত্মবোধ। ভারতের রাজন্যবর্গ তাই রাজর্ষি, আত্মজ্ঞানী বলিয়াই তাঁহারা সুশাসক। জ্ঞানীর মানস নয়নে সকল প্রতিভাত হয়। যোগীর স্বচ্ছ চিত্তে সমাজ চিত্রের মূল সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত। প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রভৃতি ধারণা করিবার শক্তি তাঁহার বিদ্যমান। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা করিবার শক্তিও তাঁহার আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞানীর শাসন আদর্শস্থানীয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে তিনটী মাত্র শাস্তির উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। সুশাসনের ফলে অপরাধ কমিয়া যায়, শাসনের দোষেই অপরাধের সংখ্যাধিক্য ও গুরুতর অপরাধের উদ্ভব হয়। ইউরোপে প্লেটোর রিপাবলিক্‌কে কাল্পনিক আদর্শরূপে (Imaginary perfection) পরিগণনা করা হইয়াছে। Brucker ইহার নিন্দাও করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। রাজ-শাসনের মূল-ভিত্তি দার্শনিকতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সঙ্গত ও শোভন। অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কখনই সমীচীন নহে। ভারতে আত্মজ্ঞানী (Participant in the ideas) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিই ব্যবস্থা-তত্ত্বের ঋষি। আত্মজ্ঞানী রাজর্ষি মান্ধাতা, জনক, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিই সুশাসক। দার্শনিকপ্রবর প্লেটোর অভিমত সম্বন্ধে জর্ম্মন্ দার্শনিক কাণ্ট্ যাহা বলিয়াছেন তাহা মনোজ্ঞ। দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট্ তাঁহার "Critique of Pure Reason" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন,—

"A constitution of the greatest possible human freedom according to laws, by which the liberty of every individual can consist with the liberty of every other (not of the

greatest possible happiness, for this follows necessarily from the former) is, to say the least, a necessary idea, which must be placed at the foundation not only of the first plan of the constitution of the state, but of all its laws. And in this it is not necessary at the outset to take account of the obstacles which lie in our way—obstacles which perhaps do not necessarily arise from the character of human nature, but rather from the previous neglect of true ideas in legislation. For there is nothing more pernicious and more unworthy of a philosopher than the vulgar appeal to a so-called adverse experience which indeed would not have existed, if those institutions had been established at the proper time and in accordance with ideas ; while instead of this, conceptions, crude for the very reason that they have drawn from experience, have marred

and frustrated all our better views and inventions. The more legislation and government are in harmony with this idea, the more rare do punishments become, and thus it is quite reasonable to maintain as Plato did, that in a perfect state no punishments at all would be necessary. Now although a perfect state may never exist, the idea is not on that account the less just, which holds up this maximum as the archetype or standard of a constitution, in order to bring legislative government always nearer and nearer to the greatest possible perfection. For at what precise degree human nature must stop its progress and how wide must be the chasm which must necessarily exist between the idea and its realization, are problems which no one can or ought to determine—and for this reason, that it is the destination of freedom

to overstep all assigned limits between itself and the idea"—Critique of Pure Reason.

অর্থাৎ এমন একটী প্রতিষ্ঠান (Constitution) গঠন করিতে হইবে যাহাতে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাসম্ভব আইন অনুসারে প্রদত্ত হইতে পারে, এবং যাহার অনুবলে এক ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখবিধান ইহার উদ্দেশ্য নহে, কারণ স্বাধীনতার ফলই সুখ। এরূপ প্রতিষ্ঠানই আদর্শ স্থানীয়। এই আদর্শ সকল শাসন-শৃঙ্খলার মূলে থাকা আবশ্যক। কেবল শাসনশৃঙ্খলার মূলে থাকিলেই হইল না, আইনের ভিত্তিও এই আদর্শের উপরে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজনীয়। এই ব্যাপারে যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বিঘ্নগুলি মনুষ্যের স্বভাব চরিত্রের ফলেই উদ্ভূত হয় না। পরন্তু ঐ আদর্শ আইনের মূলে না থাকাতেই এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। নীচভাবে তথাকথিত অভিজ্ঞতার আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা একজন দার্শনিকের পক্ষে ঘৃণিত ও অবমানজনক অন্য কিছুই হইতে পারে না। যদি এই সকল প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে

আদর্শের অনুরূপে স্থাপিত হইত তাহা হইলে এরূপ অভিজ্ঞতার কোনও স্থানই থাকিত না। ইহা না করায় অন্যরূপ ধারণার বশে আমাদের উন্নত মত ও সদিচ্ছা বিনষ্ট হইয়াছে। এই অন্যরূপ ধারণা অতীব জঘন্য। কারণ, ইহা অভিজ্ঞতার ফল। যে পরিমাণে ব্যবস্থাতত্ত্ব ও শাসনতন্ত্র এই আদর্শের সহিত সমতা রক্ষা করিবে সেই পরিমাণে শাস্তির মাত্রাও কমিয়া যাইবে। অতএব প্লেটো যাহা বলিয়াছেন—প্রকৃত সমুন্নত রাজ্যে কোনওরূপ শাস্তির আবশ্যকতা নাই—তাহা যুক্তিযুক্ত। একটী আদর্শরাষ্ট্র না থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্যই সমুন্নত আদর্শের হীনতা সাধিত হয় না। এই আদর্শই প্রতিষ্ঠানের মূল বস্তু বা মাপকাঠি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে এবং ইহার বলে ব্যবস্থাতত্ত্ব যথাসম্ভব পূর্ণ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। মানবীয় স্বভাব ক্রমোন্নতিমার্গে কতদূর অগ্রসর হইয়া থামিবে এবং আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সীমাই বা কি—ইহা একটী সমস্যা। ইহার নিষ্পত্তির চেষ্টা কেহ করিতে পারে না ও করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, নিজের ও আদর্শের ভিতরে যে সীমা আছে তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়াই স্বাধীনতার লক্ষ্য।

কাণ্টের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব দেওয়া যাইতে পারে ততই ভাল। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ও ব্যবস্থাতত্ত্ব রচিত হওয়া সমীচীন। তাহা হইলে শাস্তি কমিয়া যাইবে। আদর্শ রাজ্যে যে শাস্তি থাকিবেনা অবশ্যই আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না, কিন্তু কমিয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামরাজত্বে মাত্র তিনটী শাস্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শাস্তির বাহুল্য কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। কাণ্ট্ ও প্লেটো উভয়ই কঠোর শাস্তির বিরোধী। শাস্তির স্বল্পতা আদর্শ রাজ্যেই সম্ভব ; কিন্তু এই ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব উন্নতি লাভই প্রার্থনীয়। যে শিক্ষক কঠোর শাসন করে, তাহার ছাত্রগণ অনেক ক্ষেত্রেই দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ট হয়। যে পিতা সন্তানকে অতীব কঠোরভাবে শাসন করে, তাহার সন্তান সুশীল হইতে পারে না। রাজ-শাস্তি সম্বন্ধেও তাহাই। পিতার কঠোর শাসনে সন্তানের চরিত্র উদ্ধত ও কলুষিত হয়। কঠোর শাসনের ফলে রাজ্যেও প্রজাগণ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে।' যে দোষ দূর করিবার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়, পরিশেষে সেই দোষেই দেশ পরিপূর্ণ হয়। শাসনের একটা সীমা আছে। এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে

শাসন নির্য্যাতনে পরিণত হয়। শাস্তির তাৎপর্য্য শোধনে। এই আদর্শ ভুলিয়া গেলে শাস্তি প্রদানের প্রকৃত ফল লাভ হইতে পারে না। স্থিতি রক্ষার অন্তরেই শোধনের সিংহাসন। স্থিতিরক্ষা ও শোধন একই বস্তু। দশজনকে রক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক, একজনকে রক্ষা করাও সেইরূপই আবশ্যক। যে মূল ভিত্তির উপরে ব্যবস্থাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সেই ভিত্তির আশ্রয়রূপে আত্মজ্ঞানের বিমল ভূমি সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়। ব্যবস্থাতত্ত্ব জ্ঞানের বিমল ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই জনসাধারণের মঙ্গলকর হয়; শাস্তিপ্রদাতাও কৃতার্থ হয়; যাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহারও উন্নতি হইতে পারে। ভগবানের রুদ্ররূপও শান্তির জন্য। পালনের জন্যই ধ্বংস। ধ্বংস ও পালন একই শক্তির বিকাশ। এই মূল তত্ত্বটী ভুলিয়া গেলে শাসনের মূল উদ্দেশ্য থাকে না। তাই ভারতে রাজা আত্মজ্ঞানী। আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার উপরেই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় শক্তির বিকাশের চেষ্টা ভারতে সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত এবং ইহা ভারতের জীবনে কার্য্যকরীও হইয়াছে। অতএব ইহাকে উদ্ভট কল্পনা বলিলে চলিবে না।

"রক্ষা" সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শের বিকাশ যথাসম্ভব প্রদর্শিত হইল। এইরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান নাই। মোটামুটি ইহা হইতেই ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারে। আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য রাজকীয় দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—শিক্ষা।

শিক্ষা—শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাজকীয় কর্ত্তব্য। ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রদান প্রজার হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা কেবল ধনপ্রদানে ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি বিধান করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতেন। তখন শিক্ষা অবৈতনিক ছিল—শিক্ষার জন্য বিদ্যার্থীকে কিছুই দিতে হইত না। বিদ্যার্থী সমাজের পোষ্য। কেবল গুরুই তাহার ভরণপোষণ করিতেন না। "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ব্রহ্মচারী গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিত এবং তদ্দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিত। গুরু শিষ্যের নিকট হইতে কোনও রূপ বেতন বা বৃত্তি গ্রহণ করিতেন না। শ্রুতি বলিতেছেন—"যঃ বিদ্যামধীত্য তয়া জীবেৎ, তস্য ইহলোকঃ পরলোকো নাস্তি।" যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের ইহলোক ও পরলোকের ফল থাকে না।

রাজনীতি।

শিক্ষা অবৈতনিক করিবার জন্যই এই অনুশাসন। অদ্যাপি ভারতে সেই পুরাতন ভিত্তির ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। গুরু শিষ্যকে পালন করিতেন। গুরু শিষ্যের আহার যোগাইতেন। তজ্জন্য শিষ্যের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। এইরূপে শিক্ষার বিস্তার-কল্পে ভারতে যে মহদনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার তুলনা পৃথিবীতে কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। গ্রীস্ দেশেও অর্থগ্রহণের জন্য এক দল দার্শনিক অর্থগ্রাহীদিগকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন। কিন্তু বিদ্যা দান করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবে না—ইহাই ভারতীয় আদর্শের বিশেষত্ব। শিক্ষা বিস্তারের ইহা একমাত্র উপায়।

শিক্ষার গভীরতার জন্যও ভারতের প্রচেষ্টা সুব্যক্ত। ব্যক্তিবিশেষ স্বাভাবিক প্রেরণার বলে কোনও কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে সেই কার্য্যে তাহার দক্ষতা ও গভীরতা জন্মে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হওয়াতে শিক্ষার গভীরতাও সাধিত হইয়াছিল। কেবল ব্যাপ্তি হইলেই—বিস্তার হইলেই শিক্ষার মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে না। চাই গভীরতা। ব্যাপ্তি ও গভীরতার অপূর্ব্ব সমাবেশে ভারতীয় শিক্ষার বিধান আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে।

ভারতীয় বিধানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বর্ণী ও আশ্রমীকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত করা রাজকীয় কর্ত্তব্য। ধর্ম্মে স্থাপন রাজার ধর্ম্ম। বিষ্ণু বলিতেছেন—"বর্ণা-শ্রমানাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যস্থাপনম্"—রাজার কর্ত্তব্য। রাজা ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমীকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন। মনুও বলিয়াছেন—বর্ণী ও আশ্রমিগণের রক্ষকরূপেই রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই শিক্ষার কাল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবশ্য পালনীয়। সকলকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে যাইতে হইত। রাজকীয় বিধানে সকলেই শিক্ষার জন্য গুরুর নিকট যাইতে বাধ্য। এই বাধ্যতার ফলেও শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইত। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, তখন শূদ্রাদির শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, বৈদিকী শিক্ষা না হইলেও অন্যান্য শিক্ষা তাহারা প্রাপ্ত হইত। কারণ আপদ্ধর্ম্মে মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—"বৃদ্ধ সৎশূদ্রের নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করিবে।" রাজাকে শিল্পাদির জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শূদ্রাদির নিকট হইতে শিখিতে হইবে—ইহাও মনুর বিধান। শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি শূদ্রগণই শিক্ষা করিত। বিদুর শূদ্র; ধর্ম্মব্যাধ শূদ্র। তাঁহাদের

নিকট হইতে নীতি ও জ্ঞান শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মহাভারত পঞ্চম বেদ। তাহা পড়িবার অধিকার সকলেরই আছে। "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্"— ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। মহাভারত চারিবর্ণকেই শ্রবণ করাইবে। অতএব শূদ্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত না, ইহা আদৌ সত্য নহে। শিক্ষিত না হইলে বৃদ্ধ সৎশূদ্র কি প্রকারে শিক্ষা দিবে? ধৃতরাষ্ট্র ক্ষত্রিয় হইয়া বিদুরের নিকট উপদিষ্ট হইলেন কি প্রকারে? মনু রাজন্য-বর্গকে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি, ব্যবসায়ী ও কৃষকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে বিধান দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—"বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।" কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি কৃষকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে। ইহাতেও মনে হয়, তৎ তৎ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চবর্ণ ক্ষত্রিয়কেও শিক্ষা দিত। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ত্রিবর্ণের ভিতরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। শূদ্রাদির সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও তিন বর্ণের সম্বন্ধে কাহারও মতের ভিন্নতা থাকিতে পারে না।

দানের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভারতে পরিগণিত ছিল। ইহার নাম পরাবিদ্যা।

পরাবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মবস্তু অধিগত হয়। ইহার মত উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, নারদ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও বলিতেছেন,—"সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিচ্ছ্রুতংহ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহংভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।" তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও অভাব বোধ করিলেন এবং শোকের পরপার প্রাপ্তির জন্য গুরুর নিকট উপনীত হইলেন; ব্রহ্মবিদ্যাই পরম পুরুষার্থবোধে গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যালাভের প্রযত্ন ও বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা এই উপাখ্যানে পরিস্ফুট।

ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্য-জানশ্রুতি সংবাদেও রাজা জানশ্রুতি "বহুদায়ী বহুপাক্য" হইয়া ও নানাপ্রকার ধর্ম্মাচরণ করিয়াও শকটবান্ রৈক্যের নিকট গো ও হিরণ্য প্রভৃতি লইয়া উপনীত হইলেন। এমন কি নিজের কন্যা দান করিয়াও বিদ্যালাভ করিলেন। গ্রামদানে, কন্যাদানে তুষ্ট করিয়া সংবর্গবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতার ইহা নিদর্শন। শিক্ষাই চরম লক্ষ্য, জ্ঞানার্জ্জনই পরম

পুরুষার্থ। ইহা ভারতে প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্ত। সেই জন্যই ভারতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা। জ্ঞানের উপরেই ভিত্তি গঠন করিয়া ভারতীয় সমাজ পরিচালিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবিদ্যা দানই মুখ্যকল্প। ধর্ম্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষা প্রদত্ত হইত। শিক্ষার সহিত অনুষ্ঠান থাকাতে শিক্ষার সুফল ফলিত। বিদ্যার্থী শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিত। শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা সাধিত হইত। জাতীয় উপাদানে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় চিত্তের স্ফূর্ত্তিও সমধিক সাধিত হইত। পরাবিদ্যার নিম্নেই অপরাবিদ্যা দান বা শক্ষা প্রদান।

জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ প্রদত্ত হইত। কিন্তু শিক্ষা দিবার কর্ত্তা ব্রাহ্মণ বা প্রজার প্রতিনিধি। শিক্ষাসূত্র নির্দ্ধারণ ব্রাহ্মণের হস্তে নিয়োজিত ছিল। কেবল অর্থদানে ও শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করণে রাজার অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণের তপস্যাই শিক্ষা প্রদান। অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতিই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার জীবনে তপস্যাই জ্ঞানদান। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রজা রক্ষা, সেইরূপ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান বিতরণ। মনু বলিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।"১১।২৩৫ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজারক্ষা। ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদানের মূলেও শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা। শিক্ষকগণ যাহাতে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া তাঁহাদের অমূল্য সময় নষ্ট না করেন, ও কেবল শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারেন—এই নিমিত্তই তাঁহাদিগকে বৃত্তিপ্রদানের বন্দোবস্ত। এ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র ষড়্‌দর্শনের টীকাকার। তাঁহার রচিত বেদান্ত-দর্শনের টীকা 'ভামতী' দর্শন-জগতে এক অভিনব বস্তু। তৎপ্রণীত "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী" প্রভৃতিও সর্ব্বজন বিদিত। তিনি টীকা প্রণয়নের সময় দেশের রাজাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "মহারাজ, আমার পরিবারের যেন অর্থাভাব না হয়।" রাজাও সেই বন্দোবস্ত মত অর্থ রাখিয়া দিতেন। তাহাতেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাই নিশ্চিন্ত হইয়া তিনিও তাঁহার গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতেই এই গ্রন্থ সমূহ মানব সমাজের অমূল্য সম্পত্তিরূপে গৃহীত হইতে পারিয়াছে। "অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ"—এই কবিবাক্য সার্থক। উদরের চিন্তায় অনেক সময়ে শিক্ষার পথ

রুদ্ধ হয়। পরমহংস পরিব্রাজকগণ "Plain living and high thinking" মূল মন্ত্র করিয়া আপনাদের জীবন লোক-শিক্ষার জন্য দান করিতেন। তাঁহাদের মহিমায় সমস্ত ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পরমহংসগণও সমাজের পোষ্য। গৃহস্থগণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন রাখিয়া পরে নিজে আহার করিতেন। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী অতিথি। সেই অন্নে বিদ্যার্থী ও শিক্ষক প্রতিপালিত হইত। ইহার শেষ চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। পরমহংসগণ ভারতের অনেক গ্রন্থের ভাষ্যকার ও টীকাকার।

প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনেও একটু বিশেষত্ব ছিল। কোনও বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইত। বশিষ্ঠ কুলপতি। দশ সহস্র শিষ্য যাঁহার থাকিত তিনিই কুলপতি। দুর্ব্বাসার ষাট হাজার শিষ্য ছিল এবং "সশিষ্য মহাতপা" গমনাগমন করিতেন। বৌদ্ধ ভারতে শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভারতে তক্ষশীলা (Taxila) এবং নালন্দার বৌদ্ধ বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ বিহার-গুলিও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছে।

পরিব্রাজকগণও ভ্রমণের কালে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ স্থানে গঠিত হইয়াছে। এই সকল স্থান শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যার্থিগণ নানাদেশ হইতে সেই সকল স্থানে সমবেত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা, জাতীয় প্রণালীতে বিহিত হইয়াছে। অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তি, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই জন্যই এই সকল স্থানকে মোক্ষদায়িকা বলা হয়।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরি দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥"

মুক্তির অনুকূল জ্ঞান বিজ্ঞান এই সকল স্থানে লাভ হইত। এই জন্যই ইহাদিগকে মোক্ষদায়িকা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, তীর্থের প্রধানতম তাৎপর্য্য শিক্ষায়। তীর্থে সাধু মহাত্মা ও পণ্ডিতগণের মিলন হইত। তীর্থযাত্রিগণ তথায় উপদেশ পাইবে, জ্ঞানের মহিমার বিষয় অবগত হইবে, শিক্ষণীয় বিষয় ধারণা করিবে, শিক্ষার অনুরূপ মানসিক বৃত্তিগুলির

উন্মেষ সাধন করিবে—ইহাই তীর্থের প্রধানতম তাৎপর্য্য। ভগবান্ বুদ্ধদেব কাশীধামে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিলেন; "বারাণস্যাং গমিষ্যামি ধম্মচক্কং পবত্তামি"—এই বাক্যই বুদ্ধত্ব লাভের পরের উক্তি। কাশীই তখন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ধর্ম্মপ্রচার মানসে কাশীধামে আসিলেন। তাঁহার সময়েও বারাণসী শিক্ষার কেন্দ্র। বর্ত্তমানেও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বারাণসী জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের মানসিক মোহান্ধকার বিদূরিত করিতেছে।

বস্তুতঃ এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিত। মিথিলা ও নবদ্বীপ আধুনিক কালেও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে অধিষ্ঠিত। এই সকল স্থানের 'ডিপ্লোমা' পাইলেই শিক্ষিত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। প্রাচীনকালে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ও পরবর্ত্তী-কালে বহু বিদ্বানের সম্মিলন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়। যে স্থানে বিদ্বান্ ব্যক্তির বাস নাই সে স্থলে বাস পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। রাজার বাসস্থান মনোনয়ন প্রসঙ্গে মনু "আর্য্যপ্রায়ম্" অর্থাৎ বহু বিদ্বান্

ও ধার্ম্মিকগণ যে স্থানে বাস করেন এরূপ স্থান মনোনীত করিতে বিধান দিয়াছেন। শিক্ষার প্রাধান্য ভারতে সবিশেষ প্রদত্ত হইয়াছিল।

শিক্ষার প্রাধান্যেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। এই জন্যই ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা রাজধর্ম্ম;—"শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাং চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্।" আপাতঃদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ বলিয়াই মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞানের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও মহিমাই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের মূল। শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্যই, শিক্ষার মাহাত্ম্যের জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা যাহাতে গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, শিক্ষাই যাহাতে জীবন-ব্রত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, এই জন্যই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। উহা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য না বলিয়া জ্ঞানের ও শিক্ষার মাহাত্ম্য বলিলেই শোভন হয়।

ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর চারি ধামে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিক্ষায় এক করাই মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য। মঠগুলির আশ্রয়ে অন্যান্য ছোট বড় মঠ সংস্থাপিত হইয়া ভারতে শিক্ষার ধারা ঐককেন্দ্রিক হইবে এবং

মহতী শক্তিতে পরিণত হইয়া জাতীয় জীবনের পূর্ণতা বিধান করিবে—ইহাই ভগবান্ শঙ্করের হৃদ্গত ভাব। শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়া ঐক্য সাধনের জন্যই আচার্য্যের এই প্রচেষ্টা। শিক্ষার ধারা এক পথে পরিচালিত হইলে, শিক্ষার গতি ঐককেন্দ্রিক হইলে, শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয় উপাদানে গঠিত হইলে, জাতি এক হইয়া যায়। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, জাতির উদ্দেশ্য লক্ষ্য এক হইয়া যায়। এ শিক্ষার অর্থ চরিত্রের বলবিধান এবং মানসিক শুভ্র বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন। বাহিরের ব্যাবহারিক শিক্ষায় জাতীয় চরিত্র সমুন্নত হয় না। আন্তরিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষাদীক্ষার মিলনই যথার্থ শিক্ষা।

শিক্ষা বিস্তারের অন্য একটি পন্থা কুম্ভমেলা। এই মহামেলায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের নরনারী সম্মিলিত হইত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা হইয়া তাহা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত।

প্রাচীন ভারতের যজ্ঞগুলিও এই কার্য্য সাধন করিয়াছে। নানা দিগ্দেশাগত বিদ্বান্গণের বিচারে যজ্ঞসভা মুখরিত হইত। বিচারের ফলে শিক্ষাদীক্ষার

ধারা নির্ণীত হইত। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের চিন্তাধারার আদান প্রদান চলিত। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্রই শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইত। ইহার ফলে সাধারণ লোকও শিক্ষিত হইয়া উঠিত, এমন কি পণ্ডিতের গৃহের দাসীও নানারূপ জটিল বিষয় বুঝিতে পারিত। এ প্রসঙ্গে একটী উপাখ্যান উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডন মিশ্রের গৃহে গমন করেন তখন পথিমধ্যে কোনও মিশ্রগৃহের দাসীকে মণ্ডন মিশ্রের গৃহের বিষয় প্রশ্ন করেন। দাসী উত্তর করিল, "যে গৃহে দেখিতে পাইবে, পিঞ্জরস্থ শুকললনা 'বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়'—'কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা কি ঈশ্বরই কর্ম্ম ফলদাতা' —এরূপ বলিতেছে, সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের বলিয়া জানিবে"। শিক্ষার বিস্তৃতি সাধারণের মধ্যেও এরূপ ভাবে সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে যখন ন্যায়-দর্শনের প্রাধান্য, তখন ব্যাকরণ প্রভৃতি না পড়িয়াও তার্কিক হইয়াছে। এই জন্যই ন্যায়শাস্ত্র-প্রচলিত 'সাধ্য' বুঝিবার জন্য নিম্নের ভণিতাটি প্রচলিত হইয়াছিল।

"বান্‌মান্ বর্জ্জিয়া, সাধ্য আন গর্জ্জিয়া।
যদি না থাকে বান্‌মান্, 'ত্ব' চড়াইয়া সাধ্য আন॥"

রাজনীতি।

পুরাণ, কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়াও শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। এই সকল আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বিধান প্রজার হস্তে ছিল। রাজা শিক্ষার প্রবর্ত্তনে শুধু অর্থ সাহায্য করিতেন। শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ছিল এবং ইহার বিস্তারের জন্যও নানারূপ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শিক্ষাকে সর্ব্বাবগাহী করিবার জন্য পুরাণ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। বিদ্যার্থিগণ সমাজেরই পোষ্য ছিল।

শিক্ষক রাজার বৃত্তি পাইত। সমাজের পরিচালনায় শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গঠিত হইয়াছিল। রাজার আর্থিক সাহায্য ছিল। শিক্ষার জন্য রাজা সকলকে বাধ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার বিধান তাঁহার হস্তে ছিল না। শিক্ষার কেন্দ্রগুলিও তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইত না। শিক্ষার ব্যবস্থা প্রজা বা ব্রাহ্মণই করিতেন। এইভাবে ভারতীয় শিক্ষা রাজতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে, আপনার অপ্রতিহত গতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। ইহাতেই শিক্ষার

প্রতিষ্ঠা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারতীয় অনুশাসনের বিশেষত্ব— ভারতীয় অনুশাসনে কোমলে কঠোর, করুণে রুদ্র, চপলে গম্ভীর, চঞ্চলে প্রশান্ত—এই অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ সবিশেষ পরিস্ফুট। এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব ও ব্যবস্থাতত্ত্ব মধুময় হইয়াছে। মনুসংহিতার উদার, সরল, তেজোব্যঞ্জক অভিমত পাঠ করিলে আনন্দ ও বিস্ময়ে হৃদয় আপ্লুত হয়। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনুর মতগুলি এত মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। জর্ম্মন্ দার্শনিক্ নিট্‌শেও মনুসংহিতা পড়িয়া পুলকিত চিত্তে মনুর বৈজ্ঞানিকতার প্রশংসা করিয়াছেন। কোমলে কঠোর, করুণে রুদ্র, এই ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই ভারতীয় ভাবের বিশেষত্ব। প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে মনুসংহিতাখানি পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের ভাব-বহ্নি অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করিয়া পড়িলে লাভবান্ হইবার আশা অতি অল্প; কিন্তু বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র দার্শনিক দৃষ্টিতে পাঠ করিলে ইহাতে অনেক জিনিষ পাইবার, শিখিবার ও গ্রহণ

করিবার আছে। ইহাতে জীবন গঠনোপযোগী উপাদান হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রসার পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত, সমষ্টিগত বিকাশের ধারা সকলই সুব্যক্ত। দার্শনিকতার আদর্শে, বৈজ্ঞানিকতার আন্তর ও বাহ্য দৃষ্টিতে গ্রন্থখানি উপাদেয়। কেবল যে চশমাখানি দিয়া দেখিতে হইবে তাহা ভারতীয়ভাবে অনুরঞ্জিত হওয়া চাই।

নীতিবৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের এইরূপ নির্ভীক মতবাদে হয়ত বিচলিত হইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ব্যাবহারিক জীবনের সহিত অধ্যাত্মজীবনের মহামিলন সাধিত না হইলে নীতিবিজ্ঞানের কোনও সার্থকতা থাকে না। ভারতীয় বিধানে ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কেবল সংযোগই সাধিত হয় নাই, পরন্তু উহাদের মহামিলন সংসাধিত হইয়াছে। ইহাতেই ভারতীয় নীতিবিজ্ঞান জীবনের উপযোগী ও অনুকূল হইয়াছে। ব্যষ্টির ও সমষ্টির মিলনের মূল সূত্র খুঁজিয়া বাহির করায় ভারতীয় কর্ম্মবিজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছে। নীতিবিজ্ঞান (Ethics) সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই, গ্রীক্ নীতিবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সমষ্টি

ও ব্যষ্টির মহামিলন সাধিত হয় নাই। খৃষ্টানের নীতি-বিজ্ঞানের ধারা ও পরিণতি গ্রীক্ ও ভারতীয় ধারা হইতে স্বতন্ত্র। খৃষ্টান নীতিতে দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি সমধিক। গ্রীক্ চিন্তা অনেক পরিমাণে নির্ভীক। কিন্তু ভারতীয় নীতি সকলকে অবগাহন করিয়া নীতি-বিজ্ঞানের সম্রাট্‌রূপে অবস্থিত। গ্রীক্ নীতিবিজ্ঞানের ধারা সম্বন্ধে Dr. Harald Hoffding তৎপ্রণীত "Philosophy of Religion" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে গ্রীক্ নীতির ধারা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Greek ethics is occupied with the task of reconciling the different elements of the life and the soul. Self-assertion here occupies the first place. A man cannot rise to his best self in the absence of inner harmony; an inner order must be established so that no one element shall encroach on any other, but every element functions rightly in the great

harmony of the soul's life. And that individual who is able to place himself in a harmonious relation to the human society in which he lives, similar to that in which the single elements within his own soul stand to the whole—that is to say that individual who is able to sub-ordinate himself to the larger totality as a particular member of it—is leading the right life."

অর্থাৎ গ্রীক্ নীতিবিজ্ঞান মানসিক বিভিন্ন মৌলিক বৃত্তির সামঞ্জস্যে নিয়োজিত। আত্মপ্রতিষ্ঠাই সর্ব্বপ্রধান। আন্তরিক সমতা না থাকিলে মনুষ্য অধ্যাত্মজীবনে দাঁড়াইতে পারে না। আন্তরিক শৃঙ্খলা এরূপ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে যেন মৌলিক বস্তুগুলির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় এবং প্রত্যেক মৌলিক বৃত্তি মানসিক সমতা রক্ষার জন্য প্রকৃতরূপে নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারে। মনের প্রত্যেক বৃত্তি যেমন সমষ্টির সহিত মিলিত, সেইরূপ যে ব্যক্তি মানব সমাজের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারে সেই ব্যক্তির

জীবনই প্রকৃত জীবন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজকে সমষ্টির অধীন করিয়া সমষ্টির বিশেষ সদস্যরূপে অবস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জীবন যাপন করে।

ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানের ধারা ইহা হইতেও উচ্চতর আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমষ্টিত্বের সহিত অভিন্নভাবে স্থাপন ভারতের আদর্শ। ভারতীয় আদর্শে ব্যক্তি সমষ্টির অধীন (Subordinate) নহে। ব্যক্তি সমষ্টিকে অবগাহন করিয়া সমষ্টির সহিত একীভূত। সুতরাং ভারতীয় ভাব আরও উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল। জগতের পূজা, ভগবৎপূজা। আত্মব্যাপকতায় জগৎ সংসার আত্মায় আহুতি দিয়া সর্ব্বাত্মভাবের অবস্থিতিই ভারতীয় আদর্শ। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্॥"

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা করি সকলই, মা, তোমার পূজা।
"যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলম্ শম্ভো তবারাধনম্।"
ইহাই ভারতীয় কর্ম্মের মেরুদণ্ড। ইহাতেই ভারতীয়

রাজনীতি।

নীতির প্রতিষ্ঠা। গীতায় শ্রীভগবানের বাক্যেও উদ্ঘোষিত হইতেছে,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" ৯।২৭

ভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন,—"সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।" কর্ম্মের ব্যাপকতায় মনের ব্যাপকতা সংসাধিত হয়। বিশ্বব্যাপী নারায়ণের প্রীতির জন্য ও তদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম ব্যাপক হয়। তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে আত্মব্যাপকতা সংসাধিত হয়, ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তিও সমষ্টি স্বরূপ নারায়ণে অবগাহন করিয়া সমষ্টির সহিত এক হইয়া যায়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির একীভূত অবস্থাই ভারতীয় আদর্শ। ইহাই গ্রীক্ নীতিবিজ্ঞান হইতে ভারতীয় বিজ্ঞানের বিশেষত্ব।

'পাপ পাপ' করিয়া লোক পাপী হইয়া যায়। মনের স্বভাব এই যে, যে যাহা ভাবিবে সে সেইরূপ হইয়া যাইবে। ছুঁৎমার্গী হইয়া যাওয়া, একটা জড়বস্তুরূপে পরিণত হওয়া ভারতের আদর্শ নহে। সন্ধ্যার আচমনে দেখিতে পাই,—

"যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।" অর্থাৎ আমাতে যত পাপ আছে, তাহা অমৃতযোনি, জ্যোতিঃস্বরূপ, সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মায় আহুতি দিলাম। সকল পাপ ভস্মীভূত হউক। 'পাপ পাপ' করিয়া পাপী হওয়া ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানের আদর্শ নহে। ভারত শিক্ষা দিয়াছে "অমৃতস্য পুত্রা ইতি।" খৃষ্টানের নীতিবিজ্ঞান পাপ পাপ করিয়া মানুষকে অসার করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বাসের বাধ্যতাই খৃষ্টান্ নীতির মূল। বিচারের প্রাধান্য নাই, শ্রদ্ধার স্থল নাই। এ সম্বন্ধে Dr. Hoffding লিখিয়াছেন,—

"In Christian Ethics obedience, 'the obedience of faith is cardinal virtue—a natural consequence, this, of the principle of authority. As compared with obedience love is sub-ordinate. Pride is the greatest sin, for it refuses obedience. Egotistic self-assertion is condemned rather because it is opposed to obedience than to love. The demand for obedience is a demand

for unconditional subjection to an infinite 'power." অর্থাৎ খৃষ্টান্ নীতিবিজ্ঞানে বশ্যতা প্রধান ধর্ম্ম। কর্ত্তৃত্ববাদের ইহা স্বাভাবিক ফল। বশ্যতার সহিত তুলনায় ভালবাসা নিম্নে। অহঙ্কার ভয়ানক পাপ। কারণ অহঙ্কার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রেমের বিরোধী বলিয়া নহে, বশ্যতার বিরোধী বলিয়াই নিন্দিত। অসীম ক্ষমতার নিকট পরিপূর্ণ অধীনতাই বশ্যতার তাৎপর্য্য।

খৃষ্টানের নীতি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ইহাতে মনুষ্যকে অপদার্থ করিয়া তোলে। আত্মবিশ্বাস যাহার নাই সে পরকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। দুর্ব্বল শিশু পিতার শক্তিতেও সন্দিহান। খৃষ্টান্ ধর্ম্মনীতির উপরে মানবের জীবন সংগ্রাম অসম্ভব হয়। রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া মানুষের যে বিকাশ সাধিত হয় খৃষ্টান্ নীতি তাহার পরিপন্থী। এইরূপ নীতির ফলে ব্যক্তি ও জাতি দুর্ব্বল, অসার ও অপদার্থ হয়। বর্ত্তমান ইউরোপ গ্রীক্‌ভাবে ভাবিত, গ্রীক্‌ভাবের অনুপ্রাণনায় সঞ্জীবিত। আমাদের মনে হয়, ইউরোপে খৃষ্টান্ নীতির ছায়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত খৃষ্টান্ নীতি নাই। Dr. Hoffding আদর্শরূপে গ্রীক্ নীতিরই প্রাধান্য

দিয়াছেন। ইহাই ইউরোপের আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে,—

"We have before us the Christian and the Greek conceptions of life. And if we must choose between them, there is no doubt that our conception of life is more nearly related to the Greek conception than to that of primitive Christianity." অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে খৃষ্টান্ ও গ্রীক্ জীবন সম্বন্ধীয় ধারণা রহিয়াছে এবং যদি ইহাদের ভিতরে কোনটী পছন্দ করিতে হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিব আমাদের জীবনের ধারণা গ্রীক্ ধারণার অনুরূপ, প্রাচীন খৃষ্টান্ ধারণার অনুরূপ নহে।

মনুষ্যের দুইটী জিনিষ—একটী জীবন আর একটী সত্তা। সত্তাই তাহার আশ্রয়। জীবনের ভিত্তিও সত্তায়। কিন্তু সত্তার অন্বেষণ তাহাকে করিতে হইবে। ইহার অন্বেষণের জন্যই জীবনের বিশ্লেষণ করিতে হয়। এক প্রাণ, অন্য আত্মা। প্রাণের প্রতিষ্ঠা আত্মায়। প্রাণের অন্তরালে আত্মোপলব্ধি করিতে হইবে, আত্মার রাজসিংহাসন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; প্রাণের

ভিতর দিয়াই উহা খুঁজিতে হইবে। তাই প্রাণকে বাদ দেওয়া চলে না। আত্মোপলব্ধি হইলে প্রাণের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু উপলব্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রাণের আবশ্যকতা। সাধন প্রতিষ্ঠা, সিদ্ধি আত্মলাভ। এই সাধনের ভিতরেই সকল জাগতিক কার্য্য ও সমস্ত বিধান। বিধানের তাৎপর্য্য—ব্যক্তির ও সমষ্টির বিকাশে নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি বিবৃদ্ধ হউক; ইহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার আদর্শ। সমস্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য ভগবানের প্রেরণায়, তাঁহার প্রীতির জন্য, কেবল তাঁহারই জন্য অনুষ্ঠিত হউক—ইহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনিতে ভারতীয় নীতিবিজ্ঞান মুখরিত। এই মন্ত্রই নীতির মূলমন্ত্র। ইহাতেই প্রতিষ্ঠা। ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া জাতি, সমাজ, রাষ্ট্রকে অভিন্ন রূপে দর্শন করাই ভারতীয় সাধন। ব্যষ্টির ও সমষ্টির ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মহামিলন সাধনই ভারতীয় বিশেষত্ব। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণই সম্রাট্। নারায়ণই জাতির নরনারী। নারায়ণই দেশের অন্তরাত্মা। নারায়ণই সাধনার সাধ্য। এই মহান্ ভাবের উপরেই সকল শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় অনুশাসনে বৈজ্ঞানিকতা সুপরিস্ফুট। যে ভিত্তির উপরে ভারতীয় শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে ভিত্তিটী সুদৃঢ়। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকিলে ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিত না। জাতিকে এক করিবার চেষ্টা, 'খণ্ড ছিন্ন' ভারতকে সমকেন্দ্রিক শক্তিতে সংবদ্ধ করিবার চেষ্টা ভারতীয় অনুশাসনে সুব্যক্ত। অন্যদেশ আক্রমণ ও পরাহত করিয়া তদ্দেশস্থ জনসাধারণের অনুমতি অনুসারে তদ্দেশীয় রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন ও দান প্রভৃতিতে পরিতুষ্ট করিয়া মিত্ররূপে গ্রহণ করার বিধান দেখিয়াছি। সহযোগীরূপে পরাজিত রাজাকে গ্রহণ করা ভারতীয় নীতি। রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞবলে সহযোগি-সঙ্ঘ (Federal Union) স্থাপিত হইয়াছিল। রাজন্যবর্গ পরস্পর সাহচর্য্যের ফলে সম্মিলিত হইত। সম্মিলন শক্তির বলে খণ্ডিত ভারতকে অখণ্ডিত করিবার প্রচেষ্টাই অশ্বমেধ ও রাজসূয়ে পরিব্যক্ত। শক্তি সংহত না হইলে জাতীয় পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জাতির সমস্ত শক্তি এক প্রতিষ্ঠান রচনায় ব্যয়িত হইলে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ হইলে জাতির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি।

'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান জাতীয় জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। রাষ্ট্রীয় শক্তি সংহত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও সমবেত হইয়া যখন জাতির প্রত্যেক নরনারীতে সংক্রামিত হয় তখনই জাতীয় উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তখন জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সহযোগী, কেহ কাহারও অধীন নহে—এই ভাব প্রবল হয়। সমষ্টির শক্তির সহিত নিজ শক্তির মিলন সাধন করিয়া অবস্থিত হয়। এরূপ ভাবে সাম্রাজ্য গঠিত হইলে সাহচর্য্য থাকে, অধীনতা থাকে না। ইহাকে 'Federal Union' বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সহযোগিসঙ্ঘ প্রাণের বস্তু। ইহাতে প্রেম আছে, সমপ্রাণতা আছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির উপাদান জাতীয় ভাব। বিজাতীয় আদর্শে রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশ হইলে জাতি বাঁচিতে পারে না, জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জাতির বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় উপাদানে অবশ্যই থাকিবে। এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলে জাতির পক্ষে ইহা কখনই মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। ভারতে রাজভক্তি প্রাণের জিনিষ। রাজা প্রজার সম্বন্ধ পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। সম্রাট্ ও রাজন্যবর্গও পিতাপুত্র সম্পর্কে সম্পর্কিত। সামন্ত নরপতিগণ সম্রাটের সহিত সাহচর্য্য

ও সহযোগিতায় আনন্দ অনুভব করিত। সম্রাটের জন্য প্রাণদানে পুণ্য—এই বোধ তাহাদের অন্তরে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। এই ভাবে 'Federal Union' সাধিত হইয়াছিল। ভারতের রাজভক্তি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহা স্বচ্ছসলিলা পূততোয়া জাহ্নবী-স্রোতের ন্যায় অনাবিল। এই ভক্তির তুলনা অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই ভক্তির অনুবলে রাজা দেবতা। তাই 'Federal Union' প্রাণের জিনিষ ছিল। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ এই সহযোগিসঙ্ঘের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

ভারতীয় আদর্শ পৌরাণিক যুগে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক যুগেও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই। মৌর্য্য বংশের রাজত্বকালে সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার মৌলিক ভিত্তি পৌরাণিক আদর্শের উপর স্থাপিত। চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও সমুদ্র গুপ্ত প্রভৃতির সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক ঘটনা। সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে যে ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার বিবরণ ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নহে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সমরপরিষদ্

প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জমির বন্দোবস্ত, রাজস্বের বন্দোবস্ত, আইনের সংস্কার, রাজকীয় কর্ম্মের বিভাগ, বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে, প্রচেষ্টা, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়ের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার মূলে ভারতীয় আদর্শ নিহিত। অশোকের শিলালিপিও ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। সমুদ্র গুপ্তের অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব উত্তর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ সাম্রাজ্যের প্রতাপকেতন বহন করিয়াছে। অবশ্যই এই সাম্রাজ্যও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের অধঃপতনের কারণ।

ঐতিহাসিক যুগে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ সুপরিস্ফুট। মেগাস্থিনিস্, ফা-হিয়ান্ প্রভৃতি পর্য্যটকগণের বর্ণনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার বিষয়ে এই সকল পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতীয় অধঃপতনের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারি। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হইতেই ভারতীয় অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অমানুষিক ও অতিমানুষ কাল্পনিক আদর্শ সার্ব্বজনীন হওয়াতে ভারতীয় জাতি অধঃপতিত ও অবনত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকারীবাদ না মানিয়া কাল্পনিক নির্ব্বাণের আদর্শে আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করায় জাতি উদ্ভট কাল্পনিক হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়, যজ্ঞ প্রভৃতি বন্ধ করায় জাতি কর্ম্মবিহীন ও আলস্যপরতন্ত্র হইল। তৃতীয়, যজ্ঞে যেরূপ মিলন সাধিত হইত, তাহা রুদ্ধ হইল। সঙ্ঘ প্রভৃতি স্থাপনেও

সে দোষ নিবারিত হইল না। বৌদ্ধসঙ্ঘ আধ্যাত্মিক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার বাহিরের বাস্তবতার সহিত যোগ রহিল না। জাতি অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইল। চতুর্থ, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই মতবাদের অস্বাভাবিকতায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইল। পঞ্চম, অধিকারী না মানিয়া সকলকে সন্ন্যাসী করিবার 'বাতিকে' সমাজ স্থবির ও অথর্ব্ব হইয়া পড়িল। ভণ্ডামির প্রশ্রয়ে জাতি অবনত হইল। সন্ন্যাসের ভণ্ডামিতে সাংসারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি ঘটিল। তথাকথিত সন্ন্যাসের আবিল চটুলতায় ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল। জাতীয় অধঃপতনের বীজ বপন সংসাধিত হইল। ষষ্ঠ, বৌদ্ধসঙ্ঘগুলি আত্ম-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিল। শশাঙ্ক, নরেন্দ্র গুপ্ত ও ধর্ম্মপাল প্রভৃতির রাজত্বকালে বৌদ্ধসঙ্ঘের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি প্রণিধানযোগ্য। সপ্তম, বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষাদীক্ষার ফলে জাতি অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিকরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। উদাসীনতায় জাতির সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের উদাসীনতায় ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

সমাজের সহিত যোগাযোগ নষ্ট হয়। নির্ব্বাণের মোহমুগ্ধ আকর্ষণে স্বতন্ত্রতা অবশ্যম্ভাবী। এই স্বতন্ত্রতার ফলে সামাজিক কার্য্যে অনুৎসাহ ও অনুৎসাহের ফলেই জাতির পতন হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমাজশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইহার মূর্ত্তি প্রকট হইল। ফলে সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা রুদ্ধ হইয়া গেল। 'খণ্ড ছিন্ন' রাজ্যের পত্তন হইল।

বিশেষ প্রণিধানের সহিত দেখিলে সুস্পষ্ট বোধ হইবে যে, অশোকের পরবর্ত্তী কাল হইতেই সম্মিলন-শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। যদিও চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও তৎপরবর্ত্তী কোন কোন নরপতি সাম্রাজ্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধবাদের স্বতন্ত্রতা, সম্মিলন-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করায় জাতি অস্বাভাবিক রূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল ; সম্মিলন-শক্তি বিনষ্ট হইল। স্বভাবসিদ্ধ সম্মিলন-শক্তির বিপর্য্যয়ে সাম্রাজ্য-গঠন অসম্ভব হইয়া পড়িল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইলে অখণ্ড সাম্রাজ্য একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় ধর্ম্মের অনুশাসন—

রাজনীতি।

অশ্বমেধ ও রাজসূয়। অশ্বমেধ প্রভৃতির ফলে সম্মিলন-শক্তির দৃঢ়তা সাধিত হইত। সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টায় জাতীয় শক্তি যেমন ঐককেন্দ্রিক হইত তেমনই সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া সেই শক্তি সমস্ত জাতিতে প্রকাশিত থাকিত। 'খণ্ড ছিন্ন' ভারত বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করিতে পারে নাই, পরপদানতই হইয়াছে; সম্মিলন-শক্তির অভাব ও স্বতন্ত্রতাই ইহার কারণ। বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিষময় দান অদ্যাপি আমরা ভোগ করিতেছি। অষ্টম, আদর্শের সংঘর্ষের ফলেও জাতি অবনত হইয়াছে। বৈদিক আদর্শের সহিত বৌদ্ধ আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে জাতীয় জীবন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অকৃতকার্য্য হইয়া জাতি অলস হইয়া পড়িয়াছে। দুই সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে সমাজের যেরূপ অবনতি হয়, বিভিন্নমুখীন আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতেও সমাজের সেইরূপ অবনতি অবশ্যম্ভাবী। বৌদ্ধ আদর্শের বস্তুতন্ত্রতা (Objectivity) না থাকাতে বৈদিক আদর্শের সহিত বিরোধ হইয়াছে। বৈদিক আদর্শ ব্যক্তি ও বস্তুর মিলন-কেন্দ্র উদ্‌ঘাটিত করায় অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিল।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বিজয়-কেতন-তলে জাতিকে সংহত ও সংবদ্ধ করিতেছিল। বস্তুতন্ত্রতাহীন বৌদ্ধধর্ম্ম সংহত ও সংবদ্ধ জাতিকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুতকেন্দ্র করিয়া ফেলিল।

আমাদের দৃঢ় ধারণা, ভারতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম। মানবজীবনে শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব সুপরিস্ফুট। ব্যক্তির জীবন গঠনে চরিত্র যেমন প্রধানতঃ আবশ্যক, জাতির বা সামাজিক জীবন গঠনেও চরিত্র তেমনই আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে জাতীয় চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জন্যই রাজনৈতিক অবনতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের জন্যই রাজনৈতিক অধঃপতন হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা সবিশেষ বিচার করিয়া দেখেন নাই। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ ভারত হইতে অদ্যাপি বিদূরিত হয় নাই। বহু শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাই বীজভূত বৌদ্ধধর্ম্ম জাতির রক্তে প্রবহমান রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের এতদূর প্রভাবের কারণ অন্য কিছুই নহে, বৈদিক ধর্ম্মের

ভিত্তি হইতে নূতনতর ভাবে ইহার অভ্যুদয়। মূল ধর্ম্মের সহিত মিল থাকাতে বহিরাবরণের পার্থক্য সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় নাই। আপাতরমণীয় নির্ব্বাণবাদের আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষ মুগ্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ভাব ভারতের আত্মভাব। এই আত্মভাবের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক প্রতিষ্ঠা বলিয়াই ভারতের জনসমূহ বৌদ্ধভাবে ঐরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের প্রাধান্যের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয় নাই। বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করা জাতীয় জীবনের উপাদান নহে। ভারতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যই বৈদেশিক ও বিজাতীয় আক্রমণেও ভারতের আত্মভাব বিনষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মের এক অংশ আত্মা ও অপর অংশ আকার। আকারের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের আকার পরিবর্ত্তন করায়, ক্রমশঃ বৈদিক ধর্ম্মের বহিরাবরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে ভাবেরও কতকটা বিপর্য্যয় হইয়াছিল।

ভারতের ইতিহাসে পরবর্ত্তীকালে মুসলমান নরপতিগণও কেহ কেহ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কিন্তু সে স্থলেও জাতিগত ঐক্য সাধিত হয় নাই। মহারাষ্ট্র ও

রাজপুত জাতিও জাতিগঠনের চেষ্টা করে নাই। তাঁহাদের বীরত্বই প্রশংসনীয়। কিন্তু ভারতীয় জাতিকে একত্র সংহত ও সংবদ্ধ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের জীবনে সুপরিস্ফুট নহে। ছত্রপতি শিবাজির সেরূপ চেষ্টা থাকিলেও পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয়গণের সে ভাব আদৌ দেখা যায় না। মহারাষ্ট্র ও রাজপুতের বিরোধ, মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলার বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতিই আমাদের যুক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। জাতিগঠনের চেষ্টা থাকিলে, বিরোধ পরিহার করিয়া ও স্বতন্ত্রতা দূর করিয়া, সম্মিলন-শক্তি-বলে (Power of organisation) জাতিকে সংহত ও সংবদ্ধ করা হইত ; কিন্তু তাহা হয় নাই। আলোচনায় দেখিতে পাই, সামাজিক অবনতির সকল কারণই ভারতের জাতীয় জীবনে সবিশেষ পরিস্ফুট। আদর্শের হীনতা ও কাল্পনিক আদর্শ, আদর্শের সংঘর্ষ, সামাজিক কার্য্যে অবহেলা, ভণ্ডামির প্রশ্রয়, সম্মিলন-শক্তির অভাব, কর্ম্মকুণ্ঠা, অস্বাভাবিক স্বতন্ত্রতা, ধর্ম্মের অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি যে সকল দোষে সামাজিক অবনতি ও অধঃপতন ঘটে, তাহার সকল-গুলিই ভারতের জাতীয় জীবনে বিদ্যমান ছিল। অতএব নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, ভারতের অধঃপতনের

প্রধানতম কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম। পরবর্ত্তী কালে তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ভারতীয় অধঃপতনের সহায় হইয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মই জাতীয়তাবোধ নষ্ট করিয়া এক অপূর্ব্ব কাল্পনিক আদর্শে মুগ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানপ্রবণ বলিয়া কতকটা সজীবতা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কৃপায় ভারতবর্ষের না হইলেও বঙ্গদেশের মেরুদণ্ড কুব্জ হইয়া গিয়াছে। ভাবপ্রবণতায় বঙ্গদেশ আজিও দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। স্বতন্ত্রতার ফলে স্বার্থপরতায় জাতি ধ্বংসের পথই উন্মুক্ত করে। ভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের পতনের অন্যান্য কারণ থাকিলেও আমাদের বিবেচনায় এইগুলিই মুখ্য কারণ। বৈদিক আদর্শ পরিভ্রষ্ট হইয়াই জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মোহনে মোহিত ব্যক্তি যেরূপ দুর্ব্বল হয়, আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত জাতিও সেইরূপ অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাই ভারতের অধঃপতনের ইতিহাস। বাহিরের আক্রমণই ভারতের পতনের একমাত্র কারণ নহে ; সম্মিলন-শক্তির অভাবেই সাম্রাজ্য-প্রচেষ্টা ছিল না। সাম্রাজ্যের অভাবেই পরস্পর পরস্পরে বিরোধ হইয়াছে। বিরোধের ফলেই বৈদেশিক আক্রমণে ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে। বহির্দ্দৃষ্টিতে

দেখিলে মনে হয়, স্বর্ণপ্রসূ ভারতের স্বর্ণের লোভে লোক আকৃষ্ট হইয়াছে। এই আকর্ষণের ফলে আক্রমণ; আক্রমণের ফলে পতন; এই ধারাই ঘটনাপরম্পরাদর্শী ঐতিহাসিকের নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু কার্য্যকারণ-দর্শীর নিকট প্রতিরোধ-শক্তির অভাবই মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রতিরোধ-শক্তির অভাবের মূলে সম্মিলন-শক্তির অভাব,—কাপুরুষতা নহে। শক প্রভৃতির আক্রমণ সময়েও দেখিতে পাই, কোনও বিশেষ নরপতিই—যথা, শকারি যশোধর্ম্মদেব—তাহাদের বহিষ্করণে প্রযত্নবান্। সমস্ত দেশব্যাপী কোনও প্রচেষ্টা নাই। দেশে যে সকল অন্তর্বিপ্লব হইয়াছে, তাহাও সমস্ত দেশব্যাপী নহে। হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির রাজত্বকালে মগধ সাম্রাজ্যে যে সকল বিপ্লব হইয়াছিল তাহাও স্থানিক। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, জাতি-গঠনের প্রচেষ্টা ভুলিয়া গিয়াই ভারতীয় জাতি অধঃপতিত হইয়াছে। ভারতীয় আদর্শ-বিচ্যুত হইয়াই জাতি পতিত ও অবনত হইয়াছে। বৈদিক আদর্শ কল্পনাপ্রসূত নহে। বাস্তবত্ব থাকাতে উহার সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল, জাতি আপনার মহিমায় মহিমান্বিত ছিল। আদর্শচ্যুত হইয়া

রাজনীতি।'

জাতীয় পতন আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত ও কার্য্যকরী হইয়াছিল। বিচ্যুত আদর্শের ফলেই জাতীয় জীবন ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। আমরা অশোক প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে ধর্ম্মসন্ধ ও দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন দেখিতে পাই। রাজা ভোজ দর্শনশাস্ত্রের টীকাকার। শিলাদিত্যের দানপ্রিয়তা দার্শনিকতার নিদর্শন। কেবল প্রাচীন ভারতে নহে, বৌদ্ধ যুগেও ভারতের রাজগণ ধর্ম্মপিপাসু, ধর্ম্মতৎপর ও কোন কোন ক্ষেত্রে দার্শনিক। ঐতিহাসিক যুগেও রাজগণ প্রজার প্রতিভূ, ধর্ম্মের প্রতিনিধি। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির অনুশাসন ঐতিহাসিক যুগেও প্রমাণিত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্য গঠনের আদর্শ।

জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি বিবৃদ্ধ করিতে হইলে সমস্ত চেষ্টা একদিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের অন্তরালে যিনি, তাঁহার উপাসনায় কৃতকৃতাথ হইতে হইবে। এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনই লক্ষ্য। সাম্রাজ্য ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত। সাম্রাজ্য-যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ। তাঁহারই প্রীতির জন্য জাতিকে সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় সনাতন আদর্শ। সর্ব্বতোমুখী শক্তি রাজশক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপন মহিমায় বিকাশ পাইবে, জাতির জাগরণ সাধিত হইবে। রাজশক্তির অনুপ্রাণনায় সমস্ত জাতি সংহত ও সংবদ্ধ হইবে, ইহাই ভারতের ভাব। রাজনৈতিক যথেচ্ছাচার ভারতের উপাদান নহে। যিনি বিশ্বমানবের আশ্রয়, তিনি নারায়ণ। সমস্ত জাতির হৃদয়স্থিত নারায়ণই সম্রাট্। এই জাতীয় সাম্রাজ্যই বিরাট পুরুষ। ব্রাহ্মণই তাঁহার মস্তক, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু (হৃদয়), বৈশ্যই তাঁহার উরু এবং

শূদ্রই তাঁহার পদ। যে কোন অঙ্গ বাদ দিলে এই বিরাট পুরুষের অঙ্গহানি হয়। এই বিরাট পুরুষের মস্তিষ্কই সাম্রাজ্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অনুশীলনের পন্থা নির্দ্দেশ করিবে। হৃদয় (বাহু) সমস্ত শক্তি প্রয়োগে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ পরাহত করিয়া জ্ঞান বিস্তৃতির সহায় হইবে। উরু জাতিকে ধনশালী করিবে। শূদ্র শ্রমশিল্পে জাতির অভাব পূরণ করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলে নিয়োজিত করিবে। এই অখণ্ড মহাজাতিই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের লক্ষ্য। প্রত্যেক অঙ্গ নিজস্ব সার্থকতা রক্ষা করিয়া বিরাটের পূর্ণতা সংসাধন করিবে। সাম্রাজ্যের প্রধান উপকরণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নৈতিক বল; তাহা ব্রাহ্মণশক্তি। দ্বিতীয় উপকরণ সৈনিক বল; তাহা ক্ষাত্রশক্তি। তৃতীয় ধনবল; তাহাই বৈশ্য ও শূদ্রশক্তি। শূদ্রশক্তির কার্য্য শ্রমশিল্প, বৈশ্য শক্তির কার্য্য অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। এই উভয় শক্তি মিলিয়াই সাম্রাজ্যের ধনবল বৃদ্ধি করে। জাতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপকরণ এই শক্তি চতুষ্টয়। জাতীয় জাগরণের ইহাই উপাদান।

মদমত্ততায় সাম্রাজ্য বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। অ্যাসিরীয়, মিড,

পারস্য, গ্রীক্, রোমক, ভারতের বৌদ্ধ ও মুসলমান, আরব, স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী রোম সাম্রাজ্য। ইহার স্থায়িত্ব ২২০০ বৎসর। আসিরীয় ১৬০৯ বৎসর, গ্রীক্ ১৪০০ বৎসর, স্পেনীয় ১১০০ বৎসর, পর্ত্তুগীজ ৭০০ বৎসর ও ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্য ৫৫০ বৎসর ব্যাপী স্থায়ী হইয়াছিল। এই সকল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—বিলাসপ্রিয়তা, মদমত্তভা ও স্বার্থান্ধতা। বিলাসপরায়ণ হইলেই জাতি তুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই জাতির বিনাশ অনিবার্য্য হয়। মদমত্ততায় অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে জাতি বিধ্বস্ত হয়। ঔদ্ধত্যের বশে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজেই উন্মুক্ত করে। স্বার্থান্ধতা সর্ব্বদোষের আকর। ইহার ফলে মতের ঐক্য থাকে না, চরিত্র কলুষিত হয়, তখন দেশবাসীই দেশের শত্রু হইয়া উঠে। মদমত্ততায় রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন, বিলাসপরায়ণতায় মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন, স্বার্থান্ধতায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য হইয়াছে। স্বার্থপরতার জন্যই মার্কিন মুলুক ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ভারতীয় উপাদানে এই তিনটী জিনিষের

সদ্ভাব নাই। সংযমের উপরেই রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বিলাস পরিবর্জ্জনই প্রধানতম কর্ত্তব্য। জিতেন্দ্রিয়তাই রাজার ও জাতির মুখ্য ধর্ম্ম। ভগবৎ প্রীতিই আদর্শ। ভগবানই সাম্রাজ্যের অধিনায়ক। তিনিই মূল, তিনিই প্রতিষ্ঠা, তিনিই গতি, তিনিই পরিণতি, তিনিই জাতির ও সাম্রাজ্যের মালিক। রাজা প্রভৃতি "নিমিত্ত মাত্র"। তাই মদমত্ততা অসম্ভব। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব অধিকারে স্বাধীন থাকিয়া একই রাষ্ট্রের—একই সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত। এক ধর্ম্মপ্রাণতায়, এক দেশপ্রাণতায় জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন। এক শাসনযন্ত্রের অংশ বলিয়া স্বার্থভেদের সম্ভাবনা নাই। জাতির আশা. আকাঙ্ক্ষা এক। জাতির লক্ষ্য জ্ঞান, জাতির বল জ্ঞান, জাতির পরম পুরুষার্থ জ্ঞান, বিরাট পুরুষের পূজায় জাতির চরম লক্ষ্য লাভ হইত, জাতি আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত হইত। ভগবান্ জাতির প্রাণ, নরনারীই জাতির নারায়ণীসেনা। অতএব বিরাট পুরুষের পূজাই ভারতের ধর্ম্ম। বিরাট পুরুষই জাতির, দেশের, ধর্ম্মের অন্তরাত্মা। তিনি দেশে অবস্থিত হইয়াও দেশের অন্তরালে। যাঁহাকে দেশ জানিতে পারিতেছে না, দেশই যাঁহার শরীর, যিনি

দেশ ও অন্তর সংযমন করেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী, তিনিই অমৃত। নারায়ণই নরনারীর অন্তরাত্মা। তিনিই কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান। তিনিই রাজা তিনিই প্রজা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—তিনিই। তিনিই সাম্রাজ্যের প্রাণ, তিনিই আশ্রয়, তিনিই গতি। ভারতীয় ভাষায় তাই গীত হইয়াছে,—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

দেশ নারায়ণ। "নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"—ইহা ভগবানের বাক্য। স্বর্গ হইতেও দেশ গরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ। স্বর্গ তুচ্ছ, দেশ বড়, জাতি বড়। দেশের পূজায়, জাতির পূজায় স্বর্গ হইতেও মহত্তর ফললাভ হয়। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মুক্তি লাভ হয়—ইহাই ভারতীয় অনুশাসনের সারমর্ম্ম।

—:*:—

উপসংহার।

ক্ষত্রিয় বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ বৃক্ষের মূল, পুরবাসিগণ বৃক্ষের পত্র এবং মন্ত্রিগণ বৃক্ষের শাখা। এই রাষ্ট্রীয় বৃক্ষের সকল অংশের আবশ্যকতা সমধিক। কোনও অংশ বাদ দিলে চলিতে পারে না। সকলকে গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্রের শক্তি। প্রত্যেককে বুঝিতে দিতে হইবে যে প্রত্যেকেরই সত্তা আছে, প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য আছে। যিনি রাষ্ট্রের যে দিক্ দিয়া যে কার্য্যই করুন না কেন, তাহার কার্য্যের সার্থকতা আছে। কেবল মাথা থাকিলেই মনুষ্য চলিতে পারে না, কেবল বাহুবলেই সকল কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। মানব-শরীর যেমন অঙ্গবিশেষ বিকল হইলে অচল হইয়া পড়ে, সমাজ-শরীরও তেমনই কোনও অঙ্গ বাদ দিলে বিকল হইয়া পড়ে। উরু ও পদের আবশ্যকতাও সমধিক। প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের প্রতি, প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেই রাষ্ট্রীয় বল বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই আদর্শের উপরেই—বিরাটের সত্তার উপরেই ভবিষ্যতের সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাধন, ইহাই তপস্যা, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাতেই শান্তি। শান্তিই চরম লক্ষ্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রন্থকার প্রণীত

১।	বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস	
	প্রথম ভাগ	৪৲
	দ্বিতীয় ভাগ	৩৲
	তৃতীয় ভাগ (যন্ত্রস্থ)	
২।	সবলতা ও দুর্ব্বলতা	॥০
৩।	মহিম্নঃ স্তোত্র	৵০
৪।	সন্ধ্যা-পদ্ধতি	।০
৫।	কর্ম্মতত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)	

শ্রীযুত নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

১।	আমেরিকার স্বাধীনতা	১০
২।	পরাধীনের মুক্তি	॥০

——:*:——

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল।

২। সরস্বতী লাইব্রেরী,

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।